গবেষণা পর্ষৎ পত্রিকা

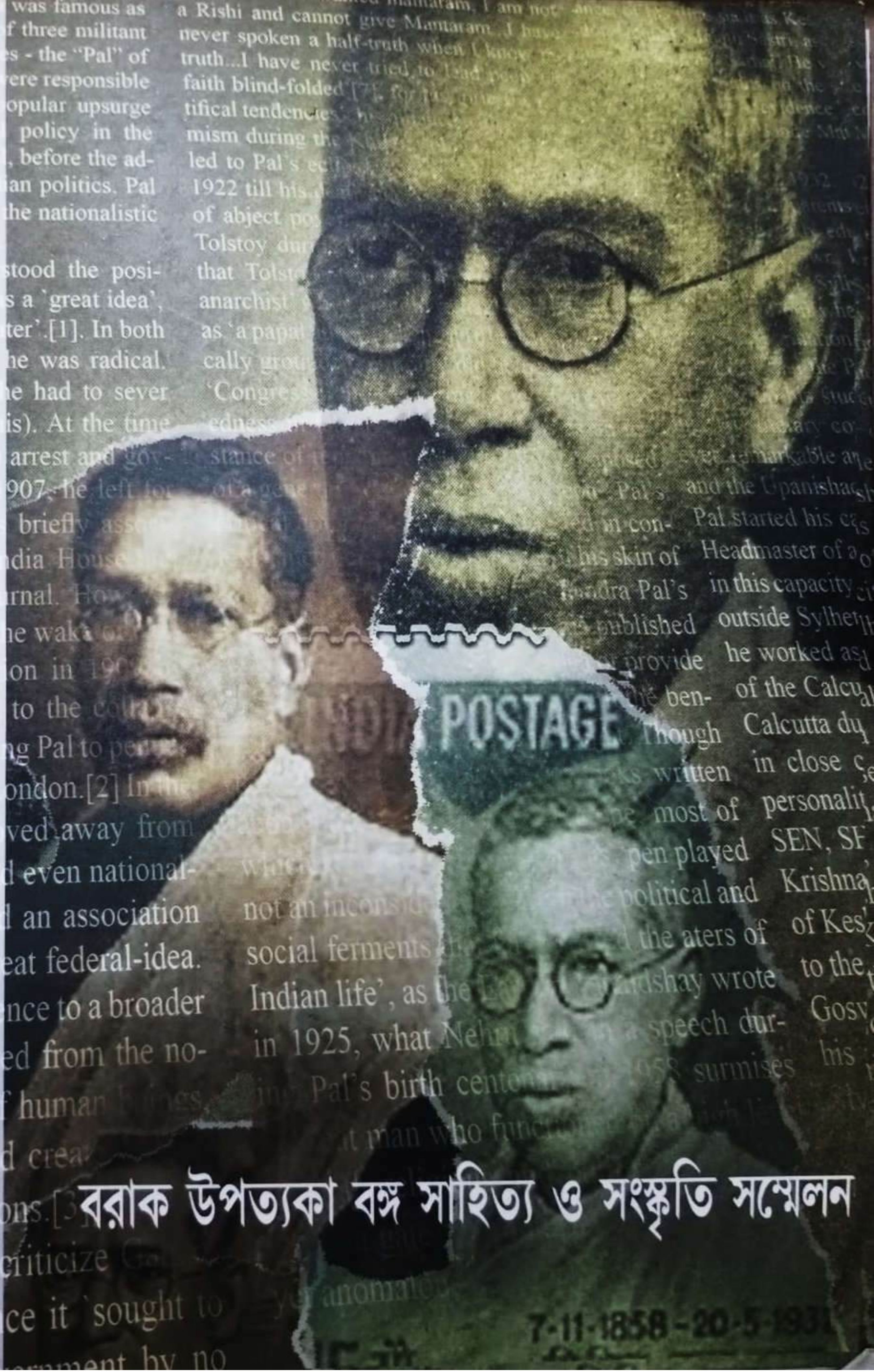
POSTAGE
7-11-1858 - 20-5-193

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

গবেষণা পর্ষৎ পত্রিকা

তৃতীয় সংখ্যা ঃ মাঘ, ১৪১৫
জানুয়ারি, ২০০৯

সম্পাদক
জন্মজিৎ রায়

গবেষণা পর্ষৎ
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

গবেষণা পর্ষৎ পত্রিকা
প্রথম সংখ্যা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ
তৃতীয় সংখ্যা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
শ্রীতরুণ দাস
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহক সমিতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

গবেষণা পর্ষৎ
ড. জন্মজিৎ রায় (আহ্বায়ক)
ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য
ড. শিবতপন বসু
অধ্যাপক আবুল হোসেন মজুমদার
ড. পরিতোষচন্দ্র দত্ত
শ্রী সঞ্জীব দেব লস্কর

প্রচ্ছদ
সন্দীপন ভট্টাচার্য

মুদ্রণ
সোম গ্রাফিক্স
স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ
আসাম- ৭৮৮ ৭১০
দূরভাষ t ৯৪৩৫০ ৭৬৪৯৮ (ম)

মূল্য ঃ ১০০.০০ (একশত) টাকা

GAVESHANA PARSHAD PATRIKA : A Research Journal, 2009, No. 3. Editor : Dr. Janmajit Roy, Head of the Dept., Bengali, Karimganj College, Karimganj-788 710, Assam.

পত্রিকার বিভিন্ন লেখায় অভিব্যক্ত মতামত লেখকদের নিজস্ব, গবেষণা পর্ষদের নয়।

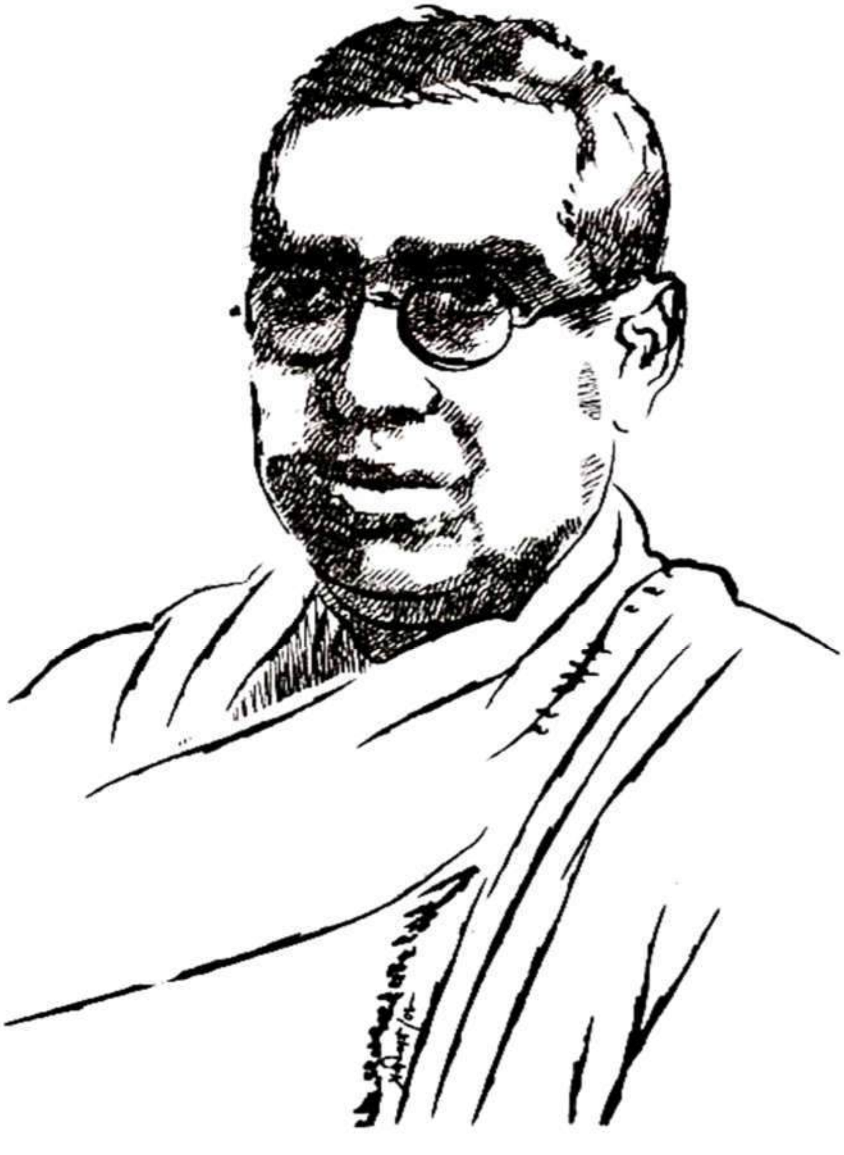

বিপিনচন্দ্র পাল

রেখাচিত্র : সন্দীপন ভট্টাচার্য

মুখবন্ধ

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন দীর্ঘদিন থেকেই মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের জন্মদিন সশ্রদ্ধ চিত্তে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করে আসছে। ২০০৭-০৮ সালে বিপিনচন্দ্রের সার্ধশতবার্ষিক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বর্ষব্যাপী উৎসবের আয়োজন একদিকে যেমন করা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে গবেষণা পর্ষদের একটি বিশেষ বিপিনচন্দ্র বিষয়ক স্মারক সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে। গবেষণা পর্ষৎ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি তারই বাস্তবায়িত রূপ। বিগত ২০০৭ সালের ২৫ নভেম্বর সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় গবেষণা পর্ষৎ পুনর্গঠিত হয়। পর্ষদের সদস্যদের এবং গবেষক লেখকদের আন্তরিক সহযোগিতায় পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার প্রকাশনা সম্ভব হল। বিশেষ করে সম্মেলনের করিমগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি ও গবেষণা পর্ষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক জন্মজিৎ রায় বর্তমান সংখ্যাকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। সোম গ্রাফিক্সের পার্থ সোম ও প্রচ্ছদশিল্পী সন্দীপন ভট্টাচার্য আমাদের সম্মেলনেরই সক্রিয় সদস্য। লেখক, সম্পাদক, প্রচ্ছদশিল্পী ও মুদ্রণশিল্পী: সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। পাঠক ও গবেষক মহলে পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি সমাদৃত হলে আমরা কৃতার্থ ও আনন্দিত হব। জয়তু বিপিনচন্দ্র।

২৬ জানুয়ারি, ২০০৯।

শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী
সভাপতি,
কেন্দ্রীয় সমিতি,
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য
ও
সংস্কৃতি সম্মেলন

তরুণ দাস
সাধারণ সম্পাদক,
কেন্দ্রীয় সমিতি,
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য
ও
সংস্কৃতি সম্মেলন

সম্পাদকীয়

১.

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, চিন্তানায়ক, বাগ্মী, রাষ্ট্রনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিশ শতকের প্রথম দশকে বিপ্লববাদী বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের আসল নেতা ছিলেন বিপিন পাল। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের ‘বিনয় সরকারের বৈঠকে’ গ্রন্থে দেখা যায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেছেন, “বিপিন পালের গলার আওয়াজ না শুনলে যুবক বাংলার জন্ম হতো না।” উনিশ শতকের নবজাগরণের বাংলা এখন আর বাস্তবে নেই, আছে গ্রন্থাগারে, জাদুঘরে কিংবা স্মৃতিলোকে। ঐতিহ্যভ্রষ্ট ও আত্মবিস্মৃত বাঙালি একুশ শতকে হয়েছে আত্মঘাতী। তবু ‘বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন’ চায় সাহিত্যচর্চা, সারস্বত অনুশীলন ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের মাধ্যমে সেতুনির্মাণের দ্বারা ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে। তাই বিপিনচন্দ্রের সার্ধশতবার্ষিকী পালন করতে উদ্যোগী হয়েছে এই সংগঠন। এই উদ্যোগেরই প্রতিফলন গবেষণা পর্ষদের পত্রিকাকে বিপিনচন্দ্র পাল সার্ধশতবার্ষিক বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশ করার সিদ্ধান্তগ্রহণে।

‘বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন’-এর ‘গবেষণা পর্ষৎ’ গঠিত হয় ১৯৯০ সালে। ‘গবেষণা পর্ষৎ পত্রিকা’র দুটি সংখ্যা এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি ১৪০২ সনের চৈত্র মাসে (মার্চ, ১৯৯৬) এবং দ্বিতীয়টি ১৪১১ সনের মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০০৫)। বর্তমান সংখ্যাটি ‘গবেষণা পর্ষৎ পত্রিকা’-র তৃতীয় আত্মপ্রকাশ।

এই সংখ্যাটি প্রকাশ করতে গিয়ে একটি পর্বতপ্রমাণ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এটা হচ্ছে বিপিনচন্দ্র বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনায় তরুণ প্রজন্মের অনৌৎসুক্য ও অনীহা। বিপিনচন্দ্র নিয়ে গবেষণা করেছেন, এ-রকম লেখকের একান্ত অভাব। বর্তমান সংখ্যায় যাঁরা তাঁদের মূল্যবান নিবন্ধ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা সকলেই সেকালের সুরমা উপত্যকা বা আজকের বরাক উপত্যকার সন্তান। বর্ষীয়ান অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ঢাকা, বিক্রমপুরের সন্তান হলেও তাঁর স্বর্গতা পত্নী উমা মুখোপাধ্যায় ছিলেন বরাক-নন্দিনী। এ সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধে বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও মনীষার, জীবন ও কর্মের, বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবু পরিকল্পনা মতো আমরা সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পারি নি। একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করা দরকার। বিপিনচন্দ্র দুটি উপন্যাস ও একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর জীবৎকালে। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার বিপিনচন্দ্র বিষয়ে আমরা কোনো নিবন্ধ পত্রস্থ করতে পারি নি। বর্তমান সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা অনেকের কাছ থেকে অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি। প্রথমেই বিপিনচন্দ্র পালের পৌত্র শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র পালের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ ও তথ্য পাঠিয়ে আমাদের প্রকাশনার কাজকে সুগম ও সহজ করেছেন। দ্বিতীয়ত, এ সংখ্যার লেখকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। যথাস্থানে তাঁদের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য প্রচ্ছদশিল্পী সন্দীপন

ভট্টাচার্যের। তার আঁকা রেখাচিত্রও এ সংখ্যার শোভা বর্ধন করেছে। মুদ্রণকর্মে নিষ্ঠাবান পার্থ সোমের কথা সবশেষে বলতে হয়। তার সহযোগিতা ছাড়া 'গবেষণা পর্ষৎ পত্রিকা'র আত্মপ্রকাশ সম্ভব হত না। বাকি যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁরা আমাদের সংগঠনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত। তাঁদের ধন্যবাদজ্ঞাপন বাহুল্যমাত্র।

২.

বিপিনচন্দ্র যখন পূর্ণবয়স্ক যুবক, তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তিনি জনসংযোগ ও বক্তৃতার একটি সর্বভারতীয় মঞ্চ পেয়ে যান। ১৯২১ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন গান্ধি, তার কিছুকাল আগে থেকেই এই মঞ্চ দখল করে ফেলেন গান্ধি ও তাঁর অনুগামী জনেরা। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে 'লাল-বাল-পাল' বলে খ্যাত সর্বভারতীয় নেতৃত্বের ত্রিমূর্তির মধ্যে শেষোক্ত দুজনের নেতৃত্বের যবনিকাপাত ঘটে। এটা কাকতালীয় কিনা বলা যায় না। ১৯২০ সালে আগস্ট মাসে বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু হয়। আর ১৯২১ সালের মার্চ মাসে বরিশাল অধিবেশনে বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায় বাত্যামুখর বিরোধিতার মুখে। নতুন যুগের উদীয়মান নেতৃত্ব বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামের পন্থাপদ্ধতি মানতে চায় নি। বিপিনচন্দ্র বাগ্মী ছিলেন, অথবা তাঁকে গণবক্তাও হয়তো বলা যায়। কিন্তু তাঁর উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতা জওহরলাল নেহেরুর ভালো লাগে নি। নেহেরুর আত্মজীবনীতে বিপিনচন্দ্র একবার মাত্র উল্লিখিত হয়েছেন। নেহেরু যখন কেম্ব্রিজের ছাত্র, তখন বিপিনচন্দ্র, লালা লাজপতরাই এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে সেখানে যান ও বক্তৃতা করেন। নেহেরু তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন, "Among those who came to us were Bipin Chandra Pal, Lajpat Rai and G.K. Gokhale. We met Bipin Pal in one of our sitting-rooms. There were only a dozen of us present but he thundered at us as if he was addressing a mass meeting of ten thousand. The volume of noise was so terrific that I could hardly follow what he was saying."

(An Autobiography, New Delhi, 1962, p.22)

এরপর নেহেরু জানিয়েছেন, বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার চাইতে লাজপতরাইয়ের বক্তৃতা তাঁর ভালো লাগে। একথা তিনি মতিলাল নেহেরুকে লিখে জানান। মতিলালও বাংলার অগ্নিবর্ষী বক্তাদের পছন্দ করতেন না।

এরপর গান্ধি প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। গান্ধি ও বিপিনচন্দ্রের ভাবাদর্শগত সংঘাত ও বিপিনচন্দ্রের প্রস্থান গভীর প্রণিধান, অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয়। বিপিনচন্দ্র যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা বলেন, গান্ধির অহিংস সত্যাগ্রহ কি তারই রূপান্তর বা প্রতিধ্বনি নয়? কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯২০ সালের ৪-৯ সেপ্টেম্বর। মহাত্মা গান্ধি সেখানে তাঁর পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলেন। তাঁর উপস্থাপিত প্রস্তাবের সূত্রে একাধিক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালের সংশোধন-প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য গান্ধিজির ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু তিনি বিপিনচন্দ্রের সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২০

সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে গান্ধির অনমনীয় মনোভাবের কথা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দেশের স্বার্থে যদি কংগ্রেস দ্বিধাখণ্ডিত হয়ে যায়, তবে সেই পরিণতির জন্যও কিছু মনে করবেন না তিনি: “To him the Khilafat and the Punjab were greater than Swaraj. Pressure had been put upon him to accept Mr. Pal’s (Bipin Chandra Pal’s) amendment, but he had come to the conclusion that he should reject it, not only on a matter of conscience, but also on the ground of political expediency as well. He had been told that he would prove by his action to be the evil genius of the Congress and other things. Such statements didnot appeal to him, if in the interests of the country, the Congress deserves to be split up, he did not mind the consequences.” (The Hindu, 8-9-1920, quoted in the Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol.XVIII, Govt. of India, pp.233-34)

কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ৮ সেপ্টেম্বর অসহযোগ বিষয়ে বক্তৃতা উপস্থাপিত করার আগে গান্ধি বলেন: “I ask you to dismiss me, for the time being from consideration. I have been charged of saintliness and a desire for dictatorship. I venture to say that I donot stand before you either as a saint or a candidate for dictatorship. I stand before you to present to you the results of my many years’ practical experience in non-co-operation.” (Young India, 15-9-1920, quoted ibid., pp. 245-46)

অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট জানতে হলে এতসব উদ্ধৃতির প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। কেননা, গান্ধিজির উত্থান আর বিপিনচন্দ্রের প্রস্থান সমকালীন এবং একই সূত্রে গ্রথিত। গান্ধির মহীরুহপ্রতিম নেতৃত্ব আশেপাশে কোনো প্রকার তরুলতার অস্তিত্ব সম্পর্কেও যে কতটা অসহিষ্ণু ছিল, এটা বুঝতে পারা যায়। অসহযোগ, আইন অমান্য কিংবা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, একথা যেমন বলা যায় না, তেমনি এ-সকল আন্দোলনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও অস্বীকার্য নয়।

কলকাতা অধিবেশনে যখন ভোটাভুটি হয়, তখন গান্ধির প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৫৫ ভোট পড়ে, আর বিপিনচন্দ্রের সংশোধন-প্রস্তাবের পক্ষে ৮৭৩। গান্ধি ও বিপিনচন্দ্রের প্রস্তাবের অনৈক্য কোথায় ছিল, সেটা বুঝতে পারা যায় ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ তারিখের ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’ প্রত্রিকায় গান্ধির বক্তব্য পড়ে। সেটা এই: “My resolution adopted the principle of the whole of the Khilafat programme, even non-payment of taxes, and advised for immediate adoption, boycott of titles and honorary offices, law-courts by litigants, schools and colleges and reformed councils. Babu Bipin Chandra Pal proposed a mission to England to present our demands and meanwhile to establish national schools, formulate arbitration courts and not to boycott the councils.” (The Collected Works, XVIII, p.261)

গান্ধি-বিপিনচন্দ্রের সংঘাতের পুনরাবৃত্তি দেখা যায় দীর্ঘদিন পর গান্ধি-সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধের ক্ষেত্রে। হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সুভাষচন্দ্র গান্ধিজির ইচ্ছানুসারেই সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু পরের বছর সুভাষচন্দ্র গান্ধিজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়ান। তাঁর পক্ষে ভোট পড়ে ১৫৮০ এবং বিপক্ষে পড়ে ১৩৭৫। দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েও শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিপিনচন্দ্র দীর্ঘ প্রকাশ্য সংঘাতে গিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে এসে নিজস্ব দল গঠনের চেষ্টা করেন নি। সুভাষচন্দ্র দুরন্ত অভিযাত্রীর উচ্চাশা নিয়ে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সৃষ্টি করেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের (১৯৩৯) ঘটনার সমালোচনা করে অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় তাঁর গান্ধি-বিষয়ক গ্রন্থে (Gandhiji: A Study, Calcutta, 1958, p.120) বলেছেন, সুভাষচন্দ্রের বিরোধী প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয়ের পর গান্ধির মতো একজন মহৎ মানুষকে "small and peevish" বলে মনে হয়। দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য সুভাষচন্দ্র তিনবছরের জন্য কংগ্রেসের কর্মকর্তা হতে পারবেন না বলে বিধান দেওয়া হয়।

বিপিনচন্দ্রকে ১৯২০-২১ সালে এবং সুভাষচন্দ্রকে ১৯৩৯ সালে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, তার পূর্বাভাস একমাত্র একজন ক্রান্তদর্শী দার্শনিক পেয়েছিলেন দীর্ঘকাল পূর্বে। তিনি শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, কংগ্রেসে বাংলার নেতৃত্ব তখন আর কেউ মানতে চাইছে না। বিপিনচন্দ্রের সম্পর্কে তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, "কেউ কেউ বিপিন পালকে বন্দেমাতরম থেকে সরিয়ে দিতে চাইত। আমি যখন অসুখে পড়ি, তাঁকে সরান হয় এবং আমার নামও তাতে জড়ায়। আমি সহকারী সম্পাদককে তলব করে এই অন্যায়ের জন্যে দারুণ শাস্তি দিই-- অবশ্য আলঙ্কারিক অর্থে। কিন্তু ক্ষতি যা তা হয়ে গেছে। বিপিন পাল ছিলেন মস্ত বক্তা। সে সময় তাঁর বক্তৃতায় আগুন জ্বলত। তাকে এক ধরনের অবতরণই বলতে পার। পরে তাঁর সেই বাকশক্তি হ্রাস পায়। আমার মনে আছে, তিনি কখনও 'স্বাধীনতা' কথাটি ব্যবহার করতেন না, সর্বদা বলতেন, 'ব্রিটিশপ্রভুত্বহীন স্বায়ত্তশাসন'। বরিশাল কনফারেন্সের পর যখন চাষীরা যোগ দিল, তখন ৪০/৫০ হাজার লোক হাজির হত বিপিন পালের বক্তৃতা শুনতে।" (নীরদবরণ, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা, পন্ডিচেরী, ১৯৬১, পৃ. ৫৪)

বিপিনচন্দ্র ছিলেন গান্ধির চাইতে বয়সে এগারো বছরের বড়। বরিশাল শহরে ১৯২১ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বিপিনচন্দ্র। সেই অধিবেশনের বিবরণ দিয়ে যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি তাঁহার ভাষণে গান্ধিজীকে 'মি: গান্ধী' বলিয়া উল্লেখ করায় ভীষণ হৈ-চৈর সৃষ্টি হইয়াছিল। জনতা দাবী তুলিল 'মহাত্মা' বলিতে হইবে। কিন্তু বিপিন পাল ছিলেন অনমনীয় -- তিনি কিছুতেই 'মহাত্মা' বলিতে রাজি হইলেন না।" (স্বাধীনতার সন্ধানে, কলকাতা, ১৯৭৭,পৃ.১০৮) ঘটনাটি কিছুই নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে অনেক কিছু। বরিশালে সেদিন সর্বপ্লাবী ভাববাদের কাছে যুক্তিবাদ পরাজিত হয়ে যায়। রেনেসাঁসের ঐতিহ্য থেকে সরে যায় বাংলা। বিদায় নেন বিপিনচন্দ্র।

৩.

বাংলার অগ্নিযুগের, তথা ভারতের উনিশ-বিশ শতকের সার্ধ তিন দশকের, ঘুম-ভাঙানিয়া চারণবক্তা বিপিনচন্দ্রের রাজনীতির বাইরেও অন্য পরিচয় আছে। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক। কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতিতে বিপিনচন্দ্রের বিদায় ঐতিহাসিক ভবিতব্য হলেও মনীষী বিপিনচন্দ্রের সাহিত্যচর্চা ও সারস্বত অনুশীলনের মূল্যায়ন কি যতটা হওয়া অভিপ্রেত ছিল, ততটা হয়েছে? কিংবা তাঁর আর্থনীতিক চিন্তার? অথবা তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের? কথাসাহিত্যিক বিপিনচন্দ্রের আবির্ভাব ১৮৮৪ সালে। তিনি দুটি উপন্যাস রচনা করেন। প্রধম উপন্যাস 'শোভনা' প্রকাশিত হয় ১২৯০ সনের মাঘ মাসে। 'শোভনা' দেশপ্রেম উদ্দীপনকারী উপন্যাস। 'হরিদাস ভারতী' ছদ্মনামে উপন্যাসটি প্রকাশ করেন বিপিনচন্দ্র। পুত্র জ্ঞানঞ্জন পালের সম্পাদনায় উপন্যাসটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই 'শোভনা' রচনা করেন বিপিনচন্দ্র। নামপত্রে লেখা রয়েছে 'শোভনা অথবা ভবিষ্য ইতিহাসের একটি অধ্যায়'। সেইসঙ্গে যে দুটি কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের একটি হচ্ছে 'না জাগিলে সব ভারত ললনা / এ ভারত আর জাগে না জাগে না।' উপন্যাসের পাঁচটি খণ্ডে মোট পরিচ্ছেদের সংখ্যা একান্ন। চতুর্থ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪১। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসের নাম 'রাগের পথে'। শিবদাস চক্রবর্তীর মতে, এটা একটা 'পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রচনা' এবং 'সংহতি' পত্রিকায় ১৩৩১ সনের বৈশাখ থেকে শুরু করে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩২৩ সনের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর গল্পগ্রন্থ 'সত্য ও মিথ্যা'। 'মৃণালের কথা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মূল ভাবধারার বিরোধিতা করে রচিত। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত (পৌষ, ১৩৩০) 'পরকীয়া' গল্পটি নিয়ে তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা ছয়। 'রাগের পথে' উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ রচনা। বিভিন্ন কারণে মনে হয়, 'শোভনা' উপন্যাসটিও তাই। কেননা, উপন্যাসটির শেষ খণ্ডে মাত্র একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে না হলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে এবং আত্মজীবনী রচনায় বিপিনচন্দ্র অনেক বেশি সার্থক। বঙ্কিমসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তাঁর ইংরাজি আত্মজীবনী 'Memories of My Life and Times' (প্রথম প্রকাশ ১৫ মে, ১৯৩২) তাঁর পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী নয়। এতে ১৮৫৭-১৮৮৪ কালপর্বের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থপ্রকাশের সময়েই, ২০মে ১৯৩২, তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৫১ সালে, তাঁর মরণোত্তরকালে, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে তাঁর রচিত 'Foreword' পড়ে জানা যায়, ১৮৬০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বাহাত্তর বছরের জীবন ও ঘটনা চিত্রণ তাঁর পরিকল্পিত ছিল। প্রকাশকের পরিকল্পনা ছিল, গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে। বিপিনচন্দ্রের বাংলা আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসর' 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মাঘ, ১৩৩৩ থেকে বৈশাখ, ১৩৩৫ পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসর ধরে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে 'সত্তর বৎসর' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এতে ১৮৫৭ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত কালপর্বের জীবন ও ঘটনার বিবরণ থাকার কথা। কিন্তু ১৮৮০ সালের পরবর্তী কোনো ঘটনা এতে স্থান পায় নি। অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী হলেও বিপিনচন্দ্রের ইংরাজি ও বাংলা আত্মজীবনীর মূল্য অপরিসীম।

৪.

শ্রীহট্ট ও কাছাড়, এই দুটি জেলার সাধারণ পরিচয় সেকালে ছিল ‘সুরমা উপত্যকা’ নামে। সুরমা উপত্যকা ছেড়ে যাঁরা সেকালে প্রবাসী হতেন, তাঁদের অনেকেই স্বগ্রাম বা স্বস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি। ‘পুরাণবোধোদ্দীপনী’-র গদ্যকার কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য শিরোমণি বা ‘সম্বাদ ভাস্কর’-এর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের কথা মনে আসে। বিপিনচন্দ্র ছিলেন ব্যতিক্রম। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয় নি। ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৪ পর্যন্ত নয় বছর বিপিনচন্দ্র পড়াশোনা করেন শ্রীহট্ট শহরের বিদ্যালয়ে। ১৮৭৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তারপর কটক অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক বিপিনচন্দ্র ১৮৭৯ সালের মে মাসে গরমের ছুটিতে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শ্রীহট্টে আসেন। এরপর ১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীহট্টে গিয়ে বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয় বা সিলেট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের রেক্টর পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮০ সালের মাঝামাঝি শ্রীহট্ট শহর থেকে তিনি প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ‘পরিদর্শক’। ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে পিতৃবিয়োগের পর তিনি শ্রীহট্টে পৈল গ্রামে গিয়ে শ্রাদ্ধতর্পণ করেন এবং পরে কলকাতায় ফিরে যান। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে বিপিনচন্দ্র তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা করতে আসেন শিলচরে ও বদরপুরে। তার আগের বছর ১৯০৬ সালে সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলন শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমার জলসুকা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। বিপিনচন্দ্র যোগ দেন সেই সম্মেলনে। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আত্মকথা (স্মৃতি ও প্রতীতি, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ.১৩৯,২৩৪) থেকে জানা যায়, ১৯২৬ সালের জুন মাসে ব্রজেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সুরমা উপত্যকা যুব সম্মেলনে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। ১৯২৮ সালেও শ্রীহট্টের সুরমা ভ্যালি কনফারেন্সে বিপিনচন্দ্র যোগ দেন। অর্থাৎ সুরমা উপত্যকার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিপিনচন্দ্রের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

৫.

গবেষণা পর্ষৎ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি ঐকভাষিক না করে কেন দ্বিভাষিক করা হল, এ-রকম প্রশ্ন হয়তো অবান্তর নয়। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক হরিদাস মুখার্জির প্রবন্ধটি ইংরেজিতে রচিত হওয়ায় তিনি এটির বাংলা তর্জমার পক্ষপাতী ছিলেন না বলে আমরা একে যথাযথ রাখতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শ্রীবিজয় দেবের প্রবন্ধনিহিত বিপিনচন্দ্রের স্বলিখিত এবং তাঁর সম্পর্কিত বাংলা রচনাপঞ্জি ডায়াক্রিটিক চিহ্ন-বিযুক্ত রোমান হরফে আমরা যেভাবে পেয়েছি, সেভাবেই ছেপেছি। সম্পাদকীয় পরিমার্জনা-প্রয়াসে ডায়াক্রিটিক চিহ্ন যোগ করা হয় নি। বাংলা প্রবন্ধগুলিতে আধুনিক বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বিপিনচন্দ্রের পুনর্মুদ্রিত রচনাংশে ও ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলিতে বানানের পরিবর্তন করা হয় নি, ভাষা ও বানান যথাযথ রাখা হয়েছে। কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেলে সেটা অনবধানবশত ও অনিচ্ছাকৃত বলেই গ্রাহ্য ও ক্ষমার্হ।

সূচিপত্র

Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee	১২	Bipin Chandra Pal: The Fiery Orator and His Struggle for Swaraj
Bhupendra Kumar Bhattacharyya	২৫	Bipin Chandra Pal : A Chronicle of Life and Events
Bijoy Dev	৪১	Bipin Chandra Pal: A Bibliography
সন্দীপ দাস	৫৪	কর্মে ও মননে বিপিনচন্দ্র ও গান্ধি
মায়া ভট্টাচার্য	৭০	বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও বিপিনচন্দ্র পাল
মনোলীনা নন্দী রায় মঞ্চে	৮১	বিপিনচন্দ্র পাল: রাজনীতির এক আপোসহীন ব্যক্তিত্ব

পুনর্মুদ্রণ

Bipin Chandra Pal	৮৯	Speech on Congress Resolution for the Repea of the Arms Act (1887)
বিপিনচন্দ্র পাল	৯৪	প্রাণতুল্যেষু
বিপিনচন্দ্র পাল	৯৮	পিতা-পুত্রে
বিপিনচন্দ্র পাল	১০২	ত্যাজ্যপুত্র

Bipin Chandra Pal : The Fiery Orator and His Struggle for Swaraj

Haridas Mukherjee
&
Uma Mukherjee

THE FATHER OF THE BENGALI REVOLUTION OF 1905

The first birth centenary of Bipin Chandra Pal (1858-1932), one of the fathers and pioneers of India’s Freedom Movement was celebrated on November 7, 1958. Sri Aurobindo, his political colleague of Swadeshi days, characterised him as “one of the mightiest prophets of Nationalism” and called him “perhaps the best and most original thinker in the country” of this time.[1] A man of mission, with original and powerful political conceptions, an ardent nationalist of the first magnitude, a great publicist and a magnificent orator, Bipinchandra was destined to become the chief architect of the Swadeshi Movernent of 1905. The prophet of a great political creed, his was the mightiest voice that was speaking against British rule in India at that early dawn of Freedom’s battle. Like Aurobindo Ghose, another great architect of the Swadeshi Movement, he also had an original and soul-stirring message to deliver to the country, but unlike the former was gifted with a unique power of carrying eloquence by which alone the minds of the multitude could be moved. In Aurobindo’s case the pen really proved mightier than the sword. while it was the voice of Bipinchandra that thundered into being the New India of his dream. During the years 1905-08 his eloquence acquired such power in the country as nobody dared deny. The alien Government began to consider him the most dangerous voice preaching sedition and discontent against the established authority. It is on account of his larger role in the making and organisation of the Swadeshi Movement that Prof. Bency Kumar Sarkar has described him as “the father of the Bengali revolution (1905-10.)”[2] “It was Pal more than anybody else”, writes he, “who constructed the revolutionary political philosophy of Young Bengal and succeeded in annexing Madras or South India to that creed. The radical nationalism which likewise cemented the alliance of Bengal with Bombay and the Punjab was more the creation of Pal

---

This paper is based on Haridas Mukherjee and Uma mukherjee’s Bepin Chandra Pal and India’s Struggle for Swaraj, Calcutta, 1958, 2nd editon, 2007 Prof. Haridas Mukherjee obliged us by handing over the manuscript during his recent visit to Silchar and granted ad verbalin permission to edit. We have taken privilege of preparing de novo the notes and references We are sorry to inform our readers that Mrs. Uma Mukherjee, his co-author and wife, died in January 2003. ---- Editor than of Ghosh. The triumvirate of the quinquennium 1905-10 was naturally known to be Lal-Bal-Pal, Lal standing for Lala Lajpat Rai of the Punjab, Bal for Bal Gangadhar Tilak, the Maratha of Bombay, and Pal for Bipin Chandra Pal of Bengal. One can then easily understand Pal's hold on the imagination, sentiments and creativities of Young India during the second decade of the twentieth century."[3]

BIPINCHANDRA'S HISTORIC TOUR OF 1907

The year 1907 witnessed in India a fierce battle between the people on the one hand and the bureaucracy on the other. At Calcutta the Moderates were put on the defensive and the Extremists came out triumphant. Although no open split between the two wings of the Congress had taken place, yet the differences between them were rapidly increasing. The Moderates had accepted at Calcutta the revolutionary resolutions passed under Extremist pressure with great mental reservation and only wished to get them cancelled at the first suitable opportunity. And this inspired their whole course of policy and action during the year 1907 when both the Moderates and the Extremists were busy in organising forces in their favour. Apart from this internal division in the Congress, there were looming on the horizon two other grave dangers. The bureaucracy was out to crush by all possible means the nationalist movement of India. The Muslims were also set against the Hindus. Under these circumstances the Extremist need for a more thorough and effective propagandism in the country was realised greater than ever. Bipinchandra outshone everybody else of the time in carrying the messages of the New Movement to the nooks and corners of the country. According to the report of the Intelligence Branch, "The chief of the itinerant demagogues was Bipin Chandra Pal who did more to inflame the minds of the masses against the Government than any one else."[4] From Government records we learn further: "Whenever districts quiet down, boycott ceases, and the agitation seems to be in danger of dying out, it is Bipin Chandra Pal or Abdul Gafur, especially the former, who is sent to stir up matters. He is a good speaker and has the power of carrying his audiences with him, and the after-effects of this man's visits to different centres are nearly always more in evidence than when other agitators have taken the lead".[5] This view is also corroborated by Sri Aurobindo who called Bipinchandra in 1908 "the foremost man among us".[6]

In January, 1907 Bipinchandra went out on the most memorable propaganda tour of his career, travelling extensively in the various parts and provinces of India. His touring programme included his visits to Rangpur (January), Dinajpur (Jan.), Allahabad (February), Benares (Feb.), Habiganj (Feb.), Comilla (Feb.), Noakhali (Feb.), Bhola (Feb.), Barisal (March), Jhalakati (March), Dacca (March), Narayangunj (March), Silchar (March), Badarpur (March). Cuttack (April), Vizagapatam (April), Vizianagram (April), Cocannada (April), Rajahmundry (April), Madras (May) and Jessore (June). Wherever he went, he gave voice to the ideals of the Extremist Party which had already got the upper hand in Indian politics. In his lecture before the Rangpur National School on January 19, Bipinchandra, after alluding to the patriotic struggle that the Americans had once waged against the British for their liberation, said: "What are our actions when we are attacked by dacoits? Do we remain silent? Now, dacoits have attacked us, but we are still sleeping... Awake, O sleepers, from the sleep of enchantment, it can last no longer. Hindus and Muhammedans, awake, let us all go and work for our country. Maddened by the sound of Krishna's flute, the Gopa females hastened to the Jamuna. Similarly you have been roused by the call of your mother-country, our patriotic feelings have been stirred, we must rise and not be inactive".[7] He compared the Bengalis with percussion caps, which themselves inexplosive, caused explosion by coming in contact with powder and shot. "The Feringhis thought", continued he, "that if these percussion caps were applied to the powder so plentiful in the Punjab and the Central Provinces, the whole of India would be on fire." He further observed that Lord Curzon had effected Partition to destroy the power of these percussion caps, but only in vain. The consternation produced by the success of the present movement in the mind of the Feringhis was the most illuminating commentary on the situation. If thirty crores of Indians, asked he, tried to liberate the Mother from bondage, what could two lakhs of Englishmen do? [8]

The same idea was also expressed by Bipinchandra in the columns of his New India on January 12, 1907. Dwelling on the efficacy of the present method of struggle that of passive resistance he said that the prevailing situation in India was too serious to be easily overcome by British prowess or diplomacy. Easier it was to crush an armed rising, but reverse was the case when three hundred millions of unarmed people organised passive resistance to render the administration of less than two lakhs of aliens absolutely impotent.[9]

Almost the same lines of arguments were employed by Bipin Chandra Pal in his address at Dinajpur on January 20, 1907. Referring to the once proud utterance of the Times to the effect that “India was won by the sword and must be retained by the sword”, he said that the present state of affairs in the country had caused such a great fear in the Anglo-Indian mind as to force even the Englishman to comment (January 18), “The present system of Government cannot endure and may even be dangerous”. The swift and unexpected turns of the national movement had taught the *Englishmen* the painful truth that no country could be governed for long by brute force alone. He advised his audience not to be misled or hoodwinked by the conciliatory policy of the bureaucrats and concluded with a word of inspiration thus: “I read in your faces the flame which is now enkindled in your heart and see that the door of future prosperity is open to you. These are the consolations to me. [10]

In course of his memorable propaganda tour in the country during the first five months of 1907, Bipin Chandra Pal functioned as the mightiest messenger of the New Spirit. He carried the gospels of Boycott, Swadeshi, Swaraj and National Education to distant parts of the land and explained everywhere in his own inimitable flashes of oratory the cardinal principles of the New Movement. His tongue flashed fire as he lectured in those days, and nobody could escape his influence once he had heard him on the platform.

At Barisal, the storm-centre of Swadeshism in Bengal, the soil which had been sanctified by the blood of martyrs, Bipinchandra delivered a brief speech on March 1, in which he called it a place of pilgrimage, comparable in sanctity with Haldighat of Rajasthan, the field of Pratap Singh’s resistance to Akbar, the Great Mughal.

The Dacca speeches of Bipin Chandra Pal (March 7 and 9) were of special significance. There he explained the term Swaraj, meaning “freedom of a nation from the thraldom of any external influence and complete control over its own affairs” (7th) and described the means (9th) for its attainment in the following words: “Lord Curzon in one of his speeches said :— ‘My work is administration and yours (referring to the British Capitalists) is exploitation’. They are two aspects of the same thing. This policy of the Feringhis must be forthwith counteracted by means of boycott, which will bring his trade and commerce to a standstill in the country and stop the work of exploitation, and also perhaps it may be expedient to stop payment of the Government revenue; and on the other hand, the work of administration must be rendered impotent by creating popular district boards and associations and forming councils to decide disputes and their other matters”. He also pleaded for the foundation of athletic schools and other educational institutions for the improvement and edification of the nation. All this, he said, would infuse into the people the spirit of self-reliance and self-help and relieve them of their constant dependence on the support of the alien Government. “Other means,” he further said, “shall suggest themselves with the gradual unfolding of events. It is impossible to forecast them, as all coming events are hidden in the womb of futurity, but it may, however, be surmised that they will take the lines of the methods employed by the French, the American, and the Russian revolutionists”. [11]

A political radical in every fibre of his being, Bipinchandra did not confine himself to mere defining Swaraj or devising its ways and means, but went even further in sketching in outlines the would-be constitution of Free India of the future. “All the provinces, under direct British administration”, declared he at Cuttack (April 10) en route to South India, “should form separate states, it may be according to nationality, with one Central Government like the United States of America. The Native States should also form separate States subject to the same authorities. There should be a President of the Indian Republic, who should exercise functions similar to those exercised by the President of the United States of America”.[12] To-day we have got in India a sovereign Republic since 1950 with an elected President at its head, but we no longer remember the man who in the very early dawn of the present century gave us the vision of Free Indian Republic !

From Cuttack Bipin Chandra Pal went to South India and Madras where he delivered inflammatory speeches on the selfsame ideals, Boycott, Swadeshi, Swaraj and National Education, at Vizagapatam (April 12-14), Vizianagram (April 15-16), Cocannada (April 17), Rajahmundry (April 19-23) and Madras (May 1-9). His political idealism found a most stirring expression in his Madras speeches.

BIPINCHANDRA AT MADRAS

From the Rowlatt Committee’s Report we learn that Bipinchandra “commenced a tour through the East Coast cities in April and arrived at Madras on the 1st of May”, 1907. The huge concourse of men that greeted his arrival in Madras and the unprecedented enthusiasm that was manifest on the occasion unmistakably demonstrated the extent to which the people of Madras were then awakened to the gospels of the New Movement of which Bipinchandra himself was a most fearless and uncompromising spokesman. “Nor did I expect", he feelingly said in course of his opening speech, "such a large gathering as I see before me. I was fortunate enough to address very large audiences in Madras on previous occasions, but this audience I am called upon to face this evening, is absolutely out of all proportion to what experience I had even in your enthusiastic city, 4 or 5 years ago. This is a proof, Sir, I take it, not merely of the idle curiosity of the people of this great city, but I take it and I am glad of that assurance that it is a proof at least of the interest that has been awakened among my countrymen here in the New Movement that has already commenced to bring about mighty transformations in the thoughts and ideals of our countrymen all over this great Indian continent" [13]

In his first speech at Madras, Bipinchandra spoke on the import or inwardness of the New Movement which was originally born as a protest against the Partition of Bengal designed to destroy the linguistic solidarity of the Bengali people. Contrary to official expectation and to the infinite rage of the bureaucracy, the people refused to accept the Partition as a "settled fact" and sought with an iron will to undo it. The agitation born instead of subsiding or losing its vitality in course of time, attacked and covered new grounds, and developed new forces. The original grievance of the dismemberment of Bengal looked small and insignificant before long, and the comprehensive and intoxicating ideal of India's Swaraj, involving even a separation from the British Empire, loomed with increasing clearness on the horizon. At Madras, Bipinchandra spoke with his customary eloquence on the different aspects and issues of the New Movement of which the supreme objective was unqualified Swaraj for India. As revealed in the official records, "On the 2nd of May in a speech at Madras he (Pal) is reported to have said that, while the British desired to make the Government in India popular without ceasing in any sense to be essentially British, the Indians desired to make it autonomous, absolutely free of the British Parliament".[14] The British administration in India, declared he in the same speech, was based on the hypnotic spell under which Indians had long been labouring. "It is hypnotism. It is Maya and Maya. And in the recognition of the Mayic character of British power in India that lies the strength of the New Movement". In his view, the British rule was still existing in India because there was a passive obedience or hypnotic spell on the part of the Indian people. "What we want is to prove this Maya, to dispel the illusion, to kill and destroy this hypnotism".[15] Bipinchandra also told the audience that the New Movement aiming at Swaraj was not a mere political movement nor was it a mere economic movement, but was. “essentially a spiritual movement” for the self-realisation of India’s destiny. [16]

Next day, Bipinchandra spoke on “The Gospel of Swaraj” which had been lately introduced into Congress politics by Dadabhai Naoroji’s historic declaration from the Congress platform at Calcutta. Naoroji had set Swaraj as India’s goal and by way of explaining said, “Self-Government as in the United Kingdom or in the Colonies, that is, Swaraj”. In Naoroji’s scheme even Self-Government of India under British paramountcy was a desirable and profitable ideal, but Bipinchandra, like Aurobindo, declared himself unequivocally in favour of complete autonomy outside the British Empire. Self-Government within the British Empire was, in his view, not practicable. “Then again, Sir, is really self-government within the Empire a practicable ideal? What would it mean? It would mean either no real self-government for us or no real overlordship for England. Would we be satisfied with a shadow of self-government? If not, would England be satisfied with a shadow of overlordship? England would not be satisfied with a shadowy overlordship We refuse to be satisfied with a shadowy self-government. And, therefore, no compromise is possible under such conditions between self-government in India and the overlordship of England”. [17]

The third speech at Madras was delivered by Bipinchandra on “Swaraj : Its Ways and Means”. In course of that speech he declared that the masses should be roused from their ancient torpor all over the country, for they were the potential source of an invincible power and that Swaraj must be won by the people themselves. “Our programme is that we shall so work in the country, so combine the resources of the people, so organise the forces of the nation, so develop the instinct of freedom in the community, that by these means we shall-shall in the imperative-compel the submission to our will of any power that may set itself against us.” [18] The Swaraj on which he was insistent was to be “the Swaraj of the Indian people, not of any section of it” and the line of policy to realise this Swaraj was that of organised Passive Resistance which he explained as “not non-active, but non-aggressive resistance within the limits of law. The broad application of this method of Passive Resistance has brought out two or three special movements in India... And by these means Boycott, National Education and Swadeshi, included in the Boycott, and by the organisation of the forces and the resources of the people, and by setting up a scheme of practical self-government running parallel to the officialised institutions of self-government in the country,-to find a school of civic duties for the people, - by these means we hope to achieve our end ... These are, broadly speaking, our methods”.[19] The ideology and technique of Passive Resistance, or Boycott as it was called in those days, was dwelt on by Bipinchandra at much length in his following lecture at Madras. He also delivered a flaming speech on “National Education”.

These Madras speeches were delivered by Bipinchandra between May 2 and May 9, 1907. He was also to address the public on the following day when “a crowd has assembled to hear him speak on the 10th of May, but he did not appear and leaflets were distributed which stated that ‘as a mark of sorrow at Lajpat Rai’s arrest and deportation Mr. Pal’s lecture announced for this evening is abandoned.” [20] Lajpat Rai was arrested and deported on May 9, 1907, and this was the culmination of a policy of repression that the bureaucrats had been relentlessly pursuing for a long time. The flood of new ideas that was sweeping over India in 1907 made the Government mad with rage. Consequently, the repression of the bureaucracy also grew by leaps and bounds. The repressive coercion of the student community, the vindictive persecution of Swadeshi leaders and workers, the gagging ordinances against public gatherings, the wanton prosecution of the nationalist papers, the reckless pursuit of the diplomatic policy of divide and rule by setting brother against brother and community against community and the summary dismissal of Government employees from service on the alleged ground of their Swadeshi feelings-these were the various lines of attack inat the bureaucracy chose to employ against the onrush of the New Movement. The outbreak of riots at Rawalpindi in the Punjab (May) as well as in Comilla and Jamalpur in Eastern Bengal (March-May, 1907) gave a worse turn to the situation. Lala Lajpat Rai and Ajit Singh were also deported out of British India. On hearing the telegraphic message as to Lajpat’s deportation at the dead of night, Aurobindo woke up and wrote out the following cryptic comment for Bande Mataram :

“The sympathetic administration of Mr. Morley has for the present attained its record-but for the present only. Lala Lajpat Rai has been deported out of British India. The fact is its own comment. The telegram goes on to say that indignation meetings have been forbidden for four days. Indignation meetings? The hour for speeches and fine writing is past. The bureaucracy has thrown down the gauntlet. We take it up. Men of the Punjab ! Race of the Lion! Show these men who would stamp you into the dust that for one

Lajpat they have taken away a hundred Lajpats will rise in this place. Let them hear a hundred times louder your war cry-Jai Hindusthan."[21]

The news of Lajpat's deportation was flashed in the Indian -journals on May 10, 1907 and this news brought Bipinchandra's lecturing tour in Madras to a close. On the following day he left for Calcutta and "the arrangements made to receive him in districts south of Madras were cancelled." He returned to Bengal like a victorious general on the completion of his touring programme. The nationalist movement everywhere in the country had gained a new accession of strength as a result of his powerful propagandism

THE IMPACT OF HIS MADRAS SPEECHES

The tremendous impact that Bipinchandra's speeches produced in South India will be easily visible from the surging wave of enthusiasm that flowed there immediately after his visit. "Babu Bipinchandra Pal", records Srinivasa Shastri, "burst into full fame in Madras as a preacher of the new political creed. For several days on the sands of the beach, he spoke words hot with emotion and subtly logical, which were wafted by the soft evening breeze to tens of thousands of listeners invading their whole souls and setting them aflame with the fever of a wild consuming desire. Oratory had never dreamed of such triumphs in India; the power of the spoken word had never been demonstrated on such a scale".[22]

From a letter written by one R. Subbiar from Srivaikuntam, dated December 23, 1907, to the Editor of Bande Mataram, we come to know that inspired by Bipinchandra's vigorous speeches, the South Indians had already established a Swadeshi Steam Navigation Company at Tuticorin and opened Swadeshi Stores at many places in that district. He informed further how the success of Swadeshi had lent an impetus to the revival of cottage industries there. Besides, he recorded with joy that purely Swadeshi National Banks as well as Cotton Mills had been started in Tanjore and Trichi on the initiative of the Nattukottai Chetties, "the Jews of this Presidency" What is more, even the idea of a National College was rapidly gaining ground. "All these changes", wrote Mr. Subbiar, "are due to our Bengal's inspired hero Bepin Chandra and to your National organ, Bande Mataram. It was only after the stirring oratory of Bepin Chandra this year in Madras, that the educated community have shaped their minds to nationalistic views, and that even we, who are situated in the southernmost district of the Peninsula, have begun to assimilate nationalistic ideas and have procured a band of true Nationalists whom we sent to Surat to side with the leaders of the Extremist party in this year's Congress". Referring to Pal's incarceration in the Bande Mataram Case, the writer added that "the sacrifice which Bepin Chandra made at the altar of the Mother-country has further stirred us to deeds of patriotism with wonderful activity, and your National organ is daily infusing the ideas of. patriotism into our minds.[23] The predominant role played by Bipinchandra as the preacher of the New Movement was also noticed by the alien Government who came to consider him the "arch-seditionist" of India.

According to the official report Bipin Chandra Pal was held responsible for the widespread unrest that was manifest in South India following his lecture tour. "An outburst of seditious activity," records the Sedition Committee Report of 1918, "followed upon the visit of Bipin Chandra and resulted in various trials in 1908," notably those of Subramania Siva and Chidambaram Pillai who "conspired together to excite disaffection towards the Government by the delivery of speeches in Tuticorin", advocating absolute Swaraj.

THE INDELIBLE IMPRINT

It will be of much interest and relevance here to bring into focus the indelible imprint inculcated by the fiery speech of Bipinchandra on the mind of Dr. S. Radhakrishnan, who attended the former's meeting on the Madras sea beach, to which event a reference has been made in a personal letter addressed to the present scribe by Pramod Ranjan Bhar, Head of the Dept. of Philosophy, Chandernagore College. The relevant portion of the letter dated 31.05.1966 may be quoted below.

"When I was reading your account of Bipinchandra's Madras tour, my memory rolled back to the past to which I am tempted to refer under the idea that it may be of some interest to you. It was the year 1928. Our revered President Radhakrishnan was then George V Professor of Philosophy in the Calcutta University and I attended his classes as a regular student of the Post-Graduate Department. It was an unfailing practice of our Professor to talk to his students on subjects of topical interest before commencing his class lecture each day. On one such occasion, I remember, while talking about his youthful days, he suddenly interrogated, "Do you know how for the first time in my life I came to understand what real nationalism is?"

He paused for a while and then went on saying in a reminiscent mood, "More than twenty years back I happened to be present in a mammoth meeting held on the Madras sea beach. I was a young man then and devoured each of the words falling from the lips of a wonderful speaker who seemed to have the magic influence of rousing me from a state of slumber. It was from him that I learnt the spirit of nationalism. This speaker hailed from your Bengal. He was Bipinchandra Pal. [24]

Notes and References :

1. Sri Aurobinda's Speeches, Calcutta, 1948, p. 61; also Sri Aurobinda on Himself and on the Mother, Pondicherry, 1953, p.52
2. Benoy Sarkar, Villages and Towns as Social Patterns, Calcutta, 1941, p. 213; also Haridas Mukherjee, Benoy Sarkarer Baithake, Calcutta, 1942, pp. 329-34
3. Sarkar, op. cit., pp.629-30
4. I.B. Records, West Bengal, File No. 117/13
5. File No. 634 of 1909 of the Govt. of Eastern Bengal and Assam.
6. Sri Aurobindo, A Great Message, Bande Mataram, March 12, 1908.
7. Confidential History Sheet (No. 49) of B.C. Pal (Abstract No 6 of 1907)
8. Ibid.
9. Confidential Report on Native-owned English Newspapers in Bengal (No. 3 of 1907) Sri Aurobindo also was equally clear and emphatic on the principle of Passive Resistance, "The passive method", he wrote in 1907, "is especially suitable to countries where the Government depends mainly for the continuance of its administration on the voluntary help and acquiescence of the subject people. The first principle of passive resistance, therefore, which the new school have placed in the forefront of their programme, is to make administration under present conditions impossible by an organized refusal to do anything which shall help either British commerce in the exploitation of the country or British officialdom in the administration of it,---unless and until the conditions are changed in the manner and to the extent demanded by the people".----Vide The Doctrine of Passive Resistance, pp. 35-36.
10. Confidential History Sheet (No. 49) of B.C. Pal (Abstract No.5 of 1907)
11. Ibid (Abstract Nos. 11 & 12 of 1907)
12. Ibid. (Abstract No. 18 of 1907)
13. Bipin Chandra Pal, Swadeshi and Swaraj, Calcutta, 1954, p.117
14. Sedition Committee Report or Rowlatt Committee's Report, Calcutta,

1918, p. 162. An identical sentiment was also expressed by Bipinchandra in the columns of the Bande Mataram in early September, 1906 as quoted in the Englishman, September 8, 1906.

15. Swadeshi and Swaraj, pp. 142, 145.

16. Ibid, p. 146.

Also see Bipinchandra's two articles on 'The Bed-rock of Indian Nationalism', incorporated in Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, 'Bande Mataram' and Indian Nationalism, Calcutta, 1957, pp. 88-96.

17. Ibid., pp. 154, 162-63.

18. Ibid., p. 199.

19. Ibid., pp. 216-17.

Also see Sri Aurobindo's book on the The Doctrine of Passive Resistance, which is a collection of his articles, originally contributed to the columns of the Bande Mataram in April, 1907.

20. Sedition Committee Report, p. 162.

21. Bande Mataram, May 10, 1907.

Also see H.P. Ghose's Aurobindo-- The Prophat of Patriotism, Calcutta, 1949, p.15 for the narration of the circumstances under which the above comment was written.

22. Haridas Mukherjee, My Master Gokhale, p.58

23. Bande Mataram, weekly edition, January 5, 1908.

24. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj, Calcutta, 2nd edition, 2007, appendix IV, pp. 120-21.

Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee : Born at the village Hashara in Vikrampur in the district of Dacca (Now in Bangladesh) in December, 1920, Prof. Haridas Mukherjee has been described as 'one of the foremost scholars of Bengal' by Dr. R. K. Dasgupta. A brilliant product of the Presidency College of Calcutta, he secured First class degrees in his Honours (History) and M. A. Examinations of the University of Calcutta and took to teaching and research as a mission of his life in the forties of the last century. He found in Uma Mukherjee his life-long partner and collaborator in research. It is time for a short pause and heave a sigh of grief that Prof. Uma Mukherjee left for her heavenly abode in January, 2003. Hailing from the Barak Valley, she undertook a long journey in her life and career and turned out to be an equally brilliant teacher and historian like her husband. She passed away in the midst of her unfinished joint research project. Dr. Radha Kumud Mukherjee once observed, “It is a pleasure to find such a rare example of historians united in wedlock and also in dedication to a common literary adventure.”

The Mukherjee couple did not tread the track of stereotyped research, but dared break open new and original lines of studies and investigations into Modern Indian History, particularly India’s struggle for freedom. The view of Dr. R. C. Majumdar is worth quoting in this regard. He observes, “They have chosen as their special subject of study the national movement and the struggle for freedom in Bengal since the end of the nineteenth century. I donot know of anybody else making such an intensive and critical study of the subject with reference to original documents.”

Their major publications, both solo and joint, may be mentioned here.

In Bengali :

হরিদাস মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকারের বৈঠকে, কলকাতা, ১৯৪২, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৩
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬০, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৩
———, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, কলকাতা, ১৯৬১, সংশোধিত সংস্করণ, ২০০৪
———, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, কলকাতা, ১৯৬১, সংশোধিত সংস্করণ, ২০০২
———, স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ, কলকাতা, ১৯৭২, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৯৬
———, বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বদেশচেতনা, কলকাতা, ২০০৪

In English :

Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, A Phase of the Swadeshi Movement : National Education, 1953
— —, ‘Bande Mataram’ and Indian Nationalism, 1957
— —, The Growth of Nationalism in India, 1957
— —, The Origins of the National Education Movement, 1957 (Rabindra Memorial Prize-winner)
— —, India’s Fight for Freedom or the Swadeshi Movement, 1958
— —, Bipin Chandra Pal and India’s Struggle for Swaraj, 1958
— —, Sri Aurobindo’s Political Thought, 1958

The awards, conferred upon them, include Rabindra Memorial Prize (1959), Rampran Gupta Gold Medal (1962) and Sri Aurobindo Puraskar (1999). They were also honoured with the D.Litt degree (Honoris Causa) by the Jadavpur University in 1999. Prof. Haridas Mukherjee was the recipient of the honorific title of Mahamahopadhyaya from Sri Sri Sitaramdas Omkarnath Sanskrita Siksha Samsad in 2003.

Bipin Chandra Pal : A Chronicle of Life and Events

Bhupendra Kumar Bhattacharyya

The nineteenth century Bengal produced a great galaxy of men and women who immeasurably contributed to various fields for the growth and development of the Indian nation. Bipin Chandra Pal was one of them. He was born at village Poil of Sylhet district (now in Bangladesh) on 7 November, 1858. His parents were Ram Chandra Pal and Narayanee Pal. He read upto F A (First Arts) in the Presidency College, Calcutta.

Bipin Chandra Pal was one of the builders of modern India. Aurobindo Ghosh described Bipin Pal "as one of the mightiest prophets of Nationalism" and "perhaps the best and most original thinker in the country." He thought much ahead of his times and in 1907 he defined Swaraj as: "Swaraj means freedom of a nation from the thraldom of any external influence and complete control over its own affairs."[1]

Participation in Congress Sessions

The establishment of Indian National Congress in 1885 was a landmark in the country's history of freedom struggle. Presiding over the first session of the Congress in Bombay on 28 and 29 December, 1885, W. C. Bonnerjee in his address defined its aims and objects as follows.

"The promotion of personal intimacy and friendship amongst all the more earnest workers in our country's cause in the different parts of the Empire....... The determination of the lines upon, and methods by which,.......it is desirable for native politicians to labour in the public interests."[2]

Bipin Pal could not remain indifferent or aloof to the national happenings and as a representative of the Sylhet Association, attended for the first time the second session of the Congress held under the presidency of Dadabhai Naoraji in Calcutta on December 28-31, 1886. In course of his maiden address he pleaded "on the need of accepting the verdict of the jury as final."[3]

As the editor of The Tribune, Lahore, he attended the third Congress session held in Madras from 27 to 29 December, 1887. It was presided over by Badruddin Tyabji. While addressing the august gathering, Pal stressed the need "on the employment of Indians in the Military Service and also the need for the repealing of the Arms Act".[4] He was the first Indian who dared to speak from the Congress rostrum for Indianisation of the armed forces and that too after a lapse of 30 years of the Sepoy Mutiny of 1857.

Pal attended the fifth annual session of the Congress held in Bombay from 26 to 28 December, 1889 under the presidency of William Wedderburn. Bipin Chandra was extremely distressed over the sub-human conditions, in which the labourers of the British-owned tea gardens in Assam were compelled to live. He, therefore, raised the case of "the wretched and down-trodden slave population of Assam" before the Congress and sought mitigation of their sufferings. He also expressed his gratitude to Charles Bradlaugh, the British labour Party for championing the cause of the Assam "Coolies" in the British Parliament.[5]

Pal participated in a number of subsequent Congress sessions except when he was out of the country and when he suffered six months' imprisonment from September 1907. His last attendance was at Nagpur session of the Congress in 1920.

Lala Lajpat Rai, Balgangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal (Lal-Bal-Pal, the triumvirate of Indian history) and Aurobindo Ghosh turned the Congress from the stage of petition, prayer and protest to an extremist organisation, Aurobindo, however, left politics and went to Pondicherry in 1910 to become Rishi Aurobindo.

KM Munshi has written that these leaders "pioneered the transformation of the national approach of the intellectuals into a broad mass movement."[6]

A Revolutionary

From 1897, Bipin Chandra started changing his views and outlook on national affairs. He captured the imagination of young Bengal, became their spokesman and his organ "New India voiced their aspirations." He was actively associated with the early revolutionary movement in Bengal. The *Anushilan Samiti* - a revolutionary organisation was founded by barrister P. Mitra in 1901 in Calcutta. In his secret report, F. C. Daly, Deputy Inspector General of Police SD, Bengal (first published as a printed booklet in 1911 by Home / Political Department) reported that "it had a strong patron in Bipin Chandra Pal."[7] The Samiti "under the guidance of P. Mitra and Bipin Chandra Pal, eventually became an extremely well-organised body, and the discipline and audacity of its members made it more formidable. 8 Daly has further added that "the extremists or nationalist party, of which Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal were the organisers in Bengal, aim at nothing short of complete freedom from British.......and hold that for this object the adoption of any measures.......are morally justifiable."[9]

James Campbell Kerr in his 'History of Political Trouble in India 1907-1911' has stated that Bipin Chandra Pal "started *New India* paper which.......gradually became seditious.......In 1905 and 1906 he addressed numerous boycott meetings, at which he made inflammatory speeches, in Calcutta and throughout Bengal and Eastern Bengal. He continued his proceedings in 1907, extending the sphere.......in February to Allahabad and in April to the Madras Presidency, through which he toured for about a month delivering seditious speeches at many of the principal towns. He was at that time a thorough extremist.......In August 1908, he went to England and first associated there with Savarkar, Chattopadhyaya and others, but about the middle of 1909 he began to withdraw from the front rank."[10]

Advent of *New India*

Bipin Chandra Pal started his famous weekly journal New India in 1901. He was the first to preach "India for Indians: This is our motto." This was displayed on the top of this journal in every issue. Prabhat Kumar Mukhopadhyay at pages 248-249 of his book 'Bharate Jatiya Andolan' (Calcutta, 1965) has mentioned that Bipin Pal succeeded in arousing self-confidence, self-reliance, nationalism and revolutionary spirit and thoughts among the Bengali youths even before the tumultuous start of the anti-partition movement in Bengal in 1905.

According to the Government, the New India contributed much to the growth and spread of unrest in Bengal and they singled out Bipin Pal and referred to a passage from it. It was: "If the Government stoops to Russian methods, people have no alternative but to imitate those plans and schemes of self-development which have created an impassivity in Russia. They can organize strikes and by mere passiveness bring the administration to a standstill."[11]

While recalling the unique contributions of Bipin Chandra during the Swadeshi Movement, R. C. Majumdar has said: "Bipin Chandra Pal had risen to the height of his stature, and preached the new policy of his party (extremist) through his elegant speeches both in English and Bengali, - and vigorous, thoughtful writings in his weekly organ, the New India."[12]

Bipin Pal's knowledge of Economics was superb, because he had the roots on the country's soil and was familiar with the weal and woe of the teeming millions. His New India was "an Economic and Educational Organ." He is, therefore, the father of economic joumalism in India. He wrote a number of articles on the economic problems facing the country in 1901 and 1902 in the *New India*. Some of then are:

The Poverty Problem in India (August 12 and 19, 1901), Indian Poverty: Production and Wealth (August 26, 1901), The Assam Planters on the War-Path (August 26, 1901), Capital and Labour in Assam (August 26, 1901), Indian Poverty: Our Mining Industries (September 2, 1901), Our Labouring Classes (September 9, 1901), The Economic Situation in India (November 4, 18 and 25, 1901), Slavery in the Assam Tea Gardens (November 11, 1901), Cooperative Credit Societies in India (December 2, 1901), Indian Poverty and British Prosperity (December 16, 1901), The Industrial Problem in India (August 28, 1902), The Handloom-Weaving Industry of India (August 28, 1902).[13]

Anti-Partition Movement : Its Impact

The year 1905 was a turning point in India's history because Bengal was partitioned in the year in accordance with Lord Curzon's (then India's Viceroy) sinister design of weakening the Bengalis. The leaders of Bengal did not take it lying down, they revolted and started the anti-partition movement to annul it. Curzon in his arrogance announced that the Partition of Bengal was "a settled fact" and the Bengal leaders were determined to unsettle it. The movement was led by Surendra Nath Banerjea, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh, Abdul Rasul and Aswini Kumar Dutta. Bipin Pal was the chief architect and the most prominent leader of the anti-partition movement. He was the preacher of the doctrine of Passive Resistance, cult of Boycott (of British goods), Swadeshi, Swaraj and National Education. These were the weapons of an unarmed people during the movement - better known as the Swadeshi Movement (1905-11) for the annulment of the Partition of Bengal. It was like a tidal wave that swept Bengal, gave a new life, new spirit, new awakening, new hope, new strength and courage to a moribund people.

The new hope in Bengal was crystallized into a song and used to be sung in the Calcutta streets by the youths in those turbulent days. The song was:

"Benche Thak Suren Bhupen
Abar Deshar Aador Holo,
Bipin Paler Baktrita Shune
Chhelera Shob Pagol Holo."

An offshoot of the movement was that it gave birth to the revolutionary movement in Bengal which in course of time spread to the Punjab, Maharashtra and then to some other States. The Swadeshi movement in Bengal marked the beginning of the country's freedom struggle against the British Raj. Gopal Krishna Gokhale in his presidential address at the Benaras session of the Congress held from 27 to 30 December, 1905 said:

"The question that is uppermost in the minds of us all at this moment is the Partition of Bengal. A cruel wrong has been inflicted on our Bengalee brethren, and the whole country has been stirred to its deepest depths in sorrow and resentment, as had never been the case before....... The tremendous upheaval of popular feeling, which has taken place in Bengal.......will constitute a landmark in the history of our national progress. For the first time since British rule began, all sections of the Indian community. have been moved by a common impulse.......to act together in offering resistance to a common wrong. A wave of true national consciousness has swept over the Province.......Bengal's heroic stand against the oppression of a harsh and uncontrolled bureaucracy has astonished and gratified all India, and her sufferings have not been endured in vain, when they have helped to draw closer all parts of the country in sympathy and in aspiration....... The most outstanding fact of the situation is that the public life of this country has received an accession of strength of great importance, and for this all India owes a deep gratitude to Bengal."[14]

The impact of the anti-partition movement on other parts of the country has been described by Gandhiji thus in 1908 :

"The real awakening (of India) took place after the Partition of Bengal" and he prophesied: "That day be considered to be the day of the partition of the British Empire. The demand for the abrogation of the Partition is tantamount to a demand for Home Rule………. The spirit generated in Bengal has spread in the north to the Punjab and in the south of Cape Comorin. 15

ERA OF *BANDE MATARAM*

In 1906 Bipin Chandra founded the Bande Mataram daily and was its editor. Later Aurobindo Ghosh became its editor. It was an organ of extremist politics. In those days it served as the principal organ of Indian nationalism and captured the imagination of young India. Dr. Surendra Nath Sen in this regard has written: “Bipin Chandra and Aurobindo adopted *Bande Mataram* as the name of their English paper that was to serve as the organ of revolutionary nationalism. During its brief existence the paper played an important part in the history of the Freedom Movement of India.”[16] About the paper, Aurobindo wrote : “The *Bande Mataram* was almost unique in journalistic history in the influence it exercised in converting the mind of people and preparing it for the revolution.”[17] In this connection, I quote below the comment of the Statesman - then a British-owned newspaper on the *Bande Mataram* : “The paper reeked with sedition patently visible between every line, but it was so skilfully written that no legal action could be taken.”[18] And R C Majumdar has observed: “With a mantric potency, *Bande Mataram* galvanised the national political consciousness.” [19]

A BELIEVER IN TRUE SECULARISM

Bipin Chandra believed, visualised and strove for a united India comprising Hindus, Muslims, Christians and others. He was a votary of a secular India. In his editorial “The Bed-rock of Indian Nationalism II” in the *Bande Mataram* (Weekly) dated 14 June 1908 he wrote: “Both Christianity and Islam have come to stay in India, and form essential elements in her present life and thought. The Hindus will no more be Christianised at present than they had been Mohammedanised under the rule of the Moslem. Neither will Indian Christians be Hinduised, or the Indian Mohammedans be converted into Hinduism. The different world religions representing different world cultures that have already found a habitation in India will remain here always, form elements of the common national life, and contribute to the evolution of the composite culture of modern India.”[20]

Bipin Chandra had also “a deeper appreciation of the cultural, social and political aspirations of the Muslims in India. Always he was found to have taken a balanced and national view on this question.” [21] While delivering a speech on the “Contribution of Islam to Indian Nationality” at Young Men’s Mohammedan Association in Madras in 1907, he espoused “the multinational character of the Indian Nation” and said: “The Indian Nation is not a Hindu nation. The Indian Nation is not a Mohammedan nation either, nor is the Indian nation composed of Hindus and Mohammedans alone. There are others....... And these different cultures, all these different communities constitute the new Indian nation.”[21]

Pal dreamt of an independent India several decades ago where “the future Indian nation will not be a nation that will profess one religion. The future Indian nation will not be a nation that will accept one social code. The future Indian nation will not be a nation that will submit itself to one particular set of spiritual or ethical disciplines” and predicted that it “will be a federated nation.”[22]

HARBINGER OF NATIONALISM IN SOUTH INDIA

Bipin Pal was the pioneer in spreading, preaching and propagating the gospel of nationalism in the Madras Presidency during his lecture tour in 1907. Srinivas Shastri’s observation on the tremendous impact of Pal’s speeches is reproduced below :

“Bipin Chandra Pal bursts out into full fame in Madras as preacher of the new political creed. For several days on the sands of the beach he spoke words hot with emotion and subtly logical which were wafted by the soft evening breeze to tens of thousands of listeners, invading their whole souls and setting them aflame with the fever of a wild consuming desire. Oratory had never dreamt of such triumphs in India, the power of the spoken word was never demonstrated on such a scale”.[23]

The Sedition Committee, 1918 in its report on the “Revolutionary Crime in Madras” has recorded: “In 1907 people in Madras Presidency was excited by a series of lectures delivered by Bipin Chandra Pal....... He commenced a tour through the East Coast cities in April and arrived in Madras on the 1st of May. The subjects on which he spoke were “Swaraj”, “Swadeshi” and “Boycott His Rajamundry visit had been followed by a students’ strike of the local Government College on 24 April, 1907. On the 2nd May, 1907, Pal in his speech said that “while the British desired to make Government of India popular without ceasing in any sense to be essentially British, the Indians desired to make it autonomous absolutely free from the British Parliament.” [25] The committee has further reported that “an outburst of seditious activity followed upon the visit of Bipin Chandra Pal and resulted in various trials in 1908.”[26]

SUFFERED IMPRISONMENT TWICE

Bipin Chandra Pal suffered imprisonment twice, the first for his refusal “to answer any question” in the Court of Kingsford, Chief Presidency Magistrate, Calcutta on 26 and 29 August, 1907 in the Bande Mataram prosecution case, where Aurobindo Ghosh was the accused. He also “declined to be sworn or affirmed as a witness for the prosecution in the Bande Mataram case.”[27] And hence Pal was sentenced to six months’ imprisonment for contempt of court. His refusal to participate in the Bande Mataram case led to Aurobindo’s acquittal. Bipin Chandra was released on 9 March, 1908 from the Buxar jail.

Bipin Pal left for London on 20 August, 1908 on a mission of nationalist propaganda sponsored by Shyamaji Krishna Verma. In London, Pal started a fortnightly journal “Swaraj”. Its first issue came out on 1 March, 1909. The paper’s entry into India was banned by the Government. He returned to India in November, 1911 and immediately on his arrival at the Bombay port, he was arrested and charged with sedition for his article “The Aetiology of the Bomb in Bengal” published in ‘Swaraj’ earlier. He was convicted and sentenced to one month’s imprisonment by a Bombay court.

CALCUTTA CONGRESS AND NAGPUR CONGRESS

Bipin Chandra attended the Special Congress session held in Calcutta in September, 1920. It was presided over by Lala Lajpat Rai. In this session Gandhiji moved his resolution on Non-co-operation as a weapon of the Congress for its fight for freedom against the British. Pal criticized and tabled an amendment to the resolution. It was supported by a great galaxy of leaders, viz, Lajpat Rai, C. R. Das, Annie Besant, Madan Mohan Malaviya, Jinnah and others. It was put to vote on 8 September and it was passed by 1886 to 884 votes. About the Calcutta Congress, Maulana Azad has written that “Bipin Chandra Pal also spoke forcefully and said that the first weapon to fight the British Government was to boycott British goods. He did not have much faith in the other items of Gandhiji’s programme.”[28]

The Nagpur Session of the Congress was held on 26 December, 1920 under the presidency of C. V. Vijiaraghavachaiar. It met to ratify the Non-co-operation resolution passed by the Calcutta Congress in September, 1920. The session adopted the Non-co-operation resolution despite strong protest by Bipin Chandra, Annie Besant, Malaviya and Jinnah. The Nagpur session was a watershed in the history of Congress supremo. Subhas Chandra Bose has written that “the non-co-operation resolution was ratified with practical unanimity, though Pandit Malaviya, Mrs. Besant, Mr. Jinnah and Mr. B. C. Pal remained irreconcilable.”[29]

PAN-ISLAMISM AND KHILAFAT

Bipin Chandra Pal was a critique of Gandhiji’s certain programmes including the Khilafat. He clearly foresaw the inherent danger of Pan-Islamism, involvement of Congress with it and warned the nation of its disastrous consequences in the country’s body politic in future. He was scoffed at the time, but was proved right after 27 years ie. 1947. At that time he was the editor of Independent, an English daily of Allahabad owned by Pandit Motilal Nehru. As its editor, he found it impossible to support the Khilafat movement and certain aspects of the Gandhian programme. He explained his position to Motilal Nehru quite frankly in his letter dated 10 September, 1920. The letter is of great historical significance and is quoted below:

“.........I am somewhat troubled over the policy that must be followed by the Independent in view of the Congress resolution on Non-co-operation. You know I do not agree with it....... But this is not the real question. That question is the domination of our nationalist policy by the Khilafat Committee. I do not know if you were aware of it that for the last 8 or 10 years, I have been the most open and relentless opponent of Pan-Islamism. I thought it was dead, and so frankly lent my pen and voice to support the Khilafat movement, but the last week has convinced me that the Khilafat was only a cover for the Pan-Islamic propaganda....... This Khilafat agitation spells a very serious danger to our cause….... Shaukat Ali has been using Mr. Gandhi for his own ends. I did not like the latter’s statement in the Subjects Committee that he did not care for Swaraj, he cared for Hindu-Muslim unity and the Khilafat. The Khilafat has precedence in his thought and endeavour over the Punjab tragedy. It is just here I sense a great danger to let ourselves be led by him. As a boy of 18, I could not sacrifice my conviction to obey my father, as a youngman I rose in revolt against Keshub Chander Sen when he developed pontificial tendencies. I fear this a millionfold more in politics. I cannot lend myself to this new spirit of hero-worship in the masses which kills the people's freedom of thought and practically paralyses by the dead weight of unreasoning reverence their individual conscience. I am not blind to the possibilities of good in the great hold that Mahatmaji has got on the populace. But there is the other side, and in the earlier stages of democracy these personal influences, particularly when they are due to the inspiration of medieval religious sentiments, are simply fatal to its future. This does not remove that inherited slave-mentality which is the root of all our degradations and miseries. And here, perhaps, may come a more fundamental conflict of inner spirit than on the Congress Resolution itself. This is how I feel. And it is for you to think and frankly tell me what might be done, under the circumstances regarding the Independent. "30 The letter was a prelude to his resignation from the Independent when he was having a fat salary from the paper. The effect of Congress-Khilafat alliance was a long-term one as "India was divided vertically and horizontally with the sword of Communalism" in August 1947.

BARISAL CONFERENCE: END OF PUBLIC LIFE

The Bengal Provincial Conference was held at Barisal from 25 March to 27 March, 1921 under the presidency of Bipin Chandra Pal. His political career came to an abrupt end when he was delivering his presidential address at the Barisal conference because he gave "a new definition of Swaraj" and criticised "the Gandhian programme of Non-co-operation on three counts".[31]These were not acceptable to the Conference including Chittaranjan Das.

On 26 March, 1921 "a large meeting was held outside the pandel....... where several delegates" including Chittaranjan Das "attacked Pal for his criticism of the Gandhian programmes. and urged the audience to accept the Non-co-operation programme 32. On the concluding day of the session Pal was shouted down by the new non-co-operators who were intolerant and not in a mood to hear any dissenting views which were at variance with Mahatma Gandhi, the new star on the country's political horizon. The audience was too hot and too impatient to hear him because he spoke of logic and not magic.

On 27 March, 1921, the closing day of the session, Bipin Pal replied "to the trenchant criticism of C. R. Das" and said: "You wanted magic, I tried to give you logic. But logic is in bad colour when the popular mind is excited. You wanted *Mantram*. I am no *Rishi* and cannot give *Mantram*. I am ordinary mortal who has all his life been beating his music out, some times stumbling upon truth, sometimes arriving at it through tedious process of introspections and circumstances, sometimes perhaps groping in half-truth or deceived by falsehood owing to the limitations of my intellect and education. But I have never spoken a half-truth when I have known the truth. I have never tried to lead people in faith blind-folded. I never expected that all of you will agree with everything I said. Such agreement is neither possible nor desirable. But I never dreamt that there would be protest against my presentation of Swaraj. This protest coming from one (CR Das) who is the leader of the present movement in Bengal has given me the greatest surprise in my life. I for one have no option but to part company with them. Conscience demands this practical protest against a tendency which I believe to be fatal to our future". [33]

The Barisal Conference marked the end of Bipin Pal's chequered career spanning over four decades. His forced exit from the public life was a great loss to the nation as it was deprived of his wise counsel, political wisdom, sagacity and maturity.

While reporting, a Bengali daily of Calcutta headlined the Barisal Conference as under :

"*Sabhapati Bhondo*
Yajna Karle Pondo"

Since his return from Barisal he led a life of isolation. National leaders and national press boycotted him and an ungrateful nation deserted him. The situation in this regard has been painfully described by Jnananjan Pal, Bipin Pal's second son and is given below: "As soon as Pal returned to Calcutta from Barisal leading national dailies started total non-co-operation with him. He was editor of the Liberty, an English daily. After Barisal Conference his connection with the daily came to an end and he was replaced....... Measures were taken to isolate him not only from political meetings but also from literary and religious gatherings....... Wild calumny was spread against his sons that Niranjan Pal had joined Indian Forest Service in England and Jnananjan Pal had accepted the post of a Deputy Magistrate in Bengal. All these were unalloyed slanders calculated to damage the patriotic fervour of Bipin Chandra Pal in the public estimation."[34]

A MEMBER OF CENTRAL ASSEMBLY

In 1923, Bipin Pal at the request of his “nationalist friends” decided to contest a Central Legislative Assembly seat from a Calcutta non-Muslim constituency as an independent candidate. His main rival was Nirmal Chunder Chandra of Swarajya Party. Despite fundamental differences with Pal, Chittaranjan Das, the Swarajya supremo wanted to have an electoral understanding with Pal at his (Das’s) terms but Pal declined to oblige him. Bipin Chandra in his election manifesto promised “to promote cleanliness in every department of political life, stoutly opposing autocratic leadership, bribery, corruption, intimidation and intrigue”. He also held out his “views of constitutional opposition to the Government abundantly clear as as opposed to the politics of confrontation and obstruction of the Swarajists”.[35] And in the election Bipin Chandra defeated Nirmal Chandra by 1068 to 561 votes.[36]

In one of his speeches in the Central Assembly, he “argued that the revolutionary movement in Bengal was the creation of the short-sighted policy of the Government of India”.[37] He, therefore, strongly pleaded for the repeal of Bengal Regulation III of 1818. In another historic speech, Bipin Pal moved a resolution for the grant of full Dominion Status to India and Jinnah fully supported it in a forceful speech.

As the three-year-term of the Central Assembly was coming to an end, Bipin Pal was again requested to seek re-election to it. He declined, and issued a statement listing the reasons. I quote: “... I could not, consistently with my long political convictions, contest the election....... In the next place, frankly speaking Legislative elections are not as yet fought among us on strictly political or public issues. Not a candidate’s political opinion, but his family connection, professional friendship, and clean-feelings, controlled the votes of the constituency. Thirdly, success at the polls is determined by how much cash one is able to spend to secure the suffrages of his electors.”[38] Saral Chatterjee, Bipin Pal’s biographer has further added that Pal “was shocked to see the steady erosion of values and the wide divergence between profession and practice in public life. He also realized that an unattached and independent candidate inspite of his qualities and character and high political ideals had no prospects in parliamentary politics.”[39]

CLOSING PHASE

In the midst of grinding poverty Bipin Pal breathed his last on 20 May, 1932 almost “unwept, unhonoured and unsung”. There was no funeral procession and only “his relations and close friends followed his bier to the cremation ground”. The Statesman (then a British-owned newspaper) in its editorial on 22 May, 1932 on the death of Bipin Chandra Pal wrote :

“All the Nationalist papers pay high tribute to the late Bipin Chandra Pal, who is acclaimed as one of the men who gave the Nationalist aspirations of India a voice. In death his service is recognised........ For seven years or more he had been dependent for a platform, upon European-owned newspapers, and there are many letters in our files which emphasise the fact that no other outlet was open to the ablest pen that has served the cause of India. There is no complaint in these letters, for Bipin Chandra Pal was above all petty resentments, but there was grief that one who had given his all to serve India should be denied, in the maturity of his views, the opening to serve India further by men who had learned all they know of the deeper purport of nationalism from his voice and pen”.[39]

Bipin Chandra Pal - the hero of the anti-partition movement in Bengal, the exponent of Passive Resistance (which Gandhiji adopted as his Non-cooperation movement in 1920), Boycott and Swadeshi, an unbending politician, a man of highest character and integrity was shabbily treated by his countrymen during the closing phase of his life. And what is most lamentable is that his unique services to the cause of the motherland have not yet been evaluated properly although we have stepped into the 62nd year of Independence.

References

1. Uma Mukhopadhyay and Haridas Mukhopadhyay, Bande Mataram O Bipin Chandra (1906-1908), Saradiya Yugabani, 1365 B S., p.80.
2. A. M. Zaidi, ed. Congress Presidential Addresses, Volume I: 1885 - 1900 New Delhi 1985, pp.18-19.
3. Biman Behari Majumdar, Militant Nationalism in India (1897-1917), Cal cutta, 1986, p. 16.
4. Ibid, p.16.
5. Political History of Assam Volume I: 1826-1919, Government of Assam, Guwahati, 1977, pp. 166-67.

6. K. M. Munshi, Pilgrimage to Freedom, Volume I, Bombay 1967, p. 68.
7. F. C. Daly, First Rebels, ed. Sankar Ghosh, Calcutta, 1981, p. 15.
8. Ibid., p. 16.
9. Ibid., p.13
10. Ibid., p. 287.
11. History And Culture of the Indian People, Volume XI : Struggle For Freedom, (General Editor, R. C. Majumdar) Bombay, 1978, p. 53.
12. Ibid., p. 83.
13. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj, Calcutta, 1958, p. 10.
14. A. M. Zaidi, ed. Congress Presidential Addresses, Volume II: 1901 - 1911 New Delhi. 1986.
15. R. C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India, Volume II, Calcutta, 1988, pp. 119, 120.
16. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, Foreward to *Bande Mataram* And Indian Nationalism (1906 - 1908), Calcutta, 1957.
17. Ibid., p. 24.
18. Ibid., p. 26.
19. Struggle For Freedom: Volume XI, p. 975.
20. Bande Mataram And Indian Nationalism, p. 94.
21. Saral Kumar Chatterjee, Bipin Chandra Pal, New Delhi, 1984, pp. 111-112.
22. Ibid., p. 112.
23. Bipin Chandra Pal, ed. Jnananjan Pal, Memories of My Life and Times, Calcutta, 1973, pp. 640 - 41.
24. Sedition Committee Report 1918, Newprint, Calcutta 1973, p. 162.
25. Ibid.
26. Ibid., p. 163.
27. Saral Kumar Chatterjee, Bipin Pal, pp. 97-98.
28. Maulana Abul Kalam Azad, India Wins Freedom, Calcutta, 1959, p. 10.
29. Netaji's Collected Works, Volume II, Calcutta, 1981, p. 47.
30. Saral Kumar Chatterjee, Bipin Chandra Pal, pp. 142-43
31. Ibid., p. 154.
32. Ibid., p. 155.
33. Ibid., p. 156.

34. Ibid., p. 158.
35. Ibid., p. 162.
36. Ibid., p. 163.
37. Manoranjan Jha, Role of Central Legislature in the Freedom Struggle, New Delhi, 1972, p. 85.
38. Saral Kumar Chatterjee, Bipin Pal, p. 164.
39. Ibid., pp. 170 - 71.

OTHER SOURCES

1. Bengal: The Nationlist Movement 1876-1940 by Leonard A Gordon, New Delhi, 1979.
2. Deshbandhu Chittaranjan Das by Hemendra Nath Das Gupta, New Delhi 1960.
3. Swadhinata Sangrame Bharater Jatiya Congress (1885-1947) by Amalesh Tripathi, Calcutta, 1990.
4. Fifty years of Politics As I Saw it by Abul Mansur Ahmad, Dhaka, Bangla desh, 1999.
5. Indian Awakening and Bengal by Nemai Sadhan Bose, Calcutta, 1990.
6. History of Indian National Congress (1832-1947) by Girija K. Mookerjee, Meerut, 1984.
7. Jinnah: Pakistan Natun Bhavna by Sailesh Kumar Bandyopadhyay, Calcutta, 1988.
8. Bharatia Jatiya Andolan by Badruddin Umar, Calcutta, 1984.

Bhupendra Kumar Bhattacharyya : Eldest son of Late Chandra Kumar Bhattacharyya, formerly editor of Surma, Silchar, Sree Bhumi, Karimganj and Janasakti, Sylhet, Bhupendra Kumar Bhattacharyya was born in his ancestral home at village Pathrikul, Satgaon of

Sylhet district on 1 March, 1932. He passed the Matriculation examination from Maulvi Bazar Government High School in 1949, obtained his B. A. degree from St. Anthony's College, Shillong in 1953.

He joined the Assam Secretariat Services in 1952 and retired as Joint Secretary to the Government of Assam in February, 1990.

Apart from contributing many articles to three Guwahati - based dailies, viz. The Assam Tribune, The Sentinel and The North-East Times, he has also contributed a number of articles to the national dailies - The Economic Times, The Statesman, The Hindustan Times and The Telegraph. Further, his article "The Brahmaputra in Assam's Economy" has been included in the book entitled "The Brahmaputra Basin Water Resources", published by Water Science and Technology Library, the Netherlands in 2004 as its Volume No. XXXXVII.

Bipin Chandra Pal : A Bibliography

Bijoy Dev

Bipin Chandra Pal's Bengali Articles

——— Pal, Bipin Chandra, Abhibhasan, Kallol, Jaistha, 1336 (B.E) Presidential speech at Manikganj, Dacca.

——— Adrister Siksa, Pravahini, Agrahayan 7, 1321.

——— Aikya Vakya Anaikya. Vangadarsan, 7th Yr., No. 12, Caitra, 1314, pp. 597-602. (Written in pseudonym "Sri") 305-26.

——— Aksay Babu O Vidhava Vivaha. Alocana, Vol. I, pp. 305-26.

——— Aksay Candra O Sahitya Sammelan. Vangadarsan, Vaisakh, 1320 (1913).

——— Amrita Garal, Alocana, Vol. I, Sravan 7, pp. 387-94.

——— Amidhinata Na Svadhinata. Navya Bharat, Bhadra, 1328.

——— Antaryami. Narayan, 1st Yr., Vol II, no. 1, Jaistha, 1324.

At the end of the poem , 'Bipin Chandra Pal's name was not mentioned, but in 'Kavicitta' ed. by Aparna Devi (pp 158-161) his name was included.

——— Acar O Pracar. Pravasi, Asvin, 1317.

——— Adi-Ras. Narayan, Vol. II (3rd Yr,), no. 2, Asad, 1324, pp. 570 - 577.

——— Agneyagiri. Vangadarsan (Nava-Paryay), Kartik, 1312.

——— Amar Rastriya Matavad, Navya Bharat, Jaistha, 1329.

——— Amara Ki Cai, Navya Bharat, Jaistha, Asad, Sravan, 1328.

——— Ar Ekkhani Patra, Narayan, 4th Yr., Vol. I, no. 5, Caitra, 1324, pp.333-351.

——— Avedan O Andolan. Bharati, Phalgun, 1313.

——— Bhasar Katha. Narayan, Vol. I, no. 2, Pous, 1321, pp. 146 - 158,

——— Bhikhari. Vangadarsan (Nava-paryay), Kartik, 1312 (written under the pseudonym "Sri".)

——— Brahma Samaj O Raja Rammohun. Narayan. 2nd Yr., Vol. I, no. 5, Caitra, 1322, pp. 439-468.

——— Brahma Samajer Katha: Maharsi Devendranath. Narayan, 5th Yr., Vol. II, no. 2, Asad, 1326, pp. 95 - 100.

——— Brahma Samajer Katha: Maharsi Devendranather Siddhanta O Narayan, 5th Yr., Vol. II, no. 3, Sravan. 1326, pp 191 - 198.

——— Brahma Samajer Katha: Rammohun O Tanhar Pantha. Narayan, 5th Yr., Vol. II, no. 1, Jaistha, 1326, pp. 13-20.

——— Buddhimaner Karma. Narayan, 3rd Yr., Vol. II, no. 4, Bhadra, 1324, pp. 789 - 809; no. 5-6, Asvin, Kartik, 1324, pp. 816-840.

——— Carit-Citra: Vankimcandra. Narayan. Vol. I, no 6. Vaisakfa, 1322, pp. 647 - 663; Vol. II, no. 1, Jaistha, 1322, pp. 671-686.

——— Cin Kahini. Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. II, no. 11, Phalgun, 1309, pp. 582 - 587 (Written under the pseudonym “Sri”)

——— Dharma, Niti O Art. Narayan. Vol. II, no. 5 Asvin, 1322, pp. 1160 - 1127.

——— Dharma. Niti O Art Narayan. Vol. I, no. 1 (2nd Yr.,), Agrahayan, 1322. pp. 7 - 30.

——— Duer Majhe. Pravahini, Sravan 30, 1321.

——— Ekkhani Patra. Narayan, 4th Yr., Vol. I, no. 3, Magh, 1324, pp 223 - 332.

——— Ekti Stotra. Narayan, 3rd Yr., Vol. I, no. 5, Caitra, 1323, pp. 327 - 332.

——— Esa. Vangadarsan, Asad, Bhadra, Asvin, 1320.

——— Esa: Paricay. Esa - Vangiya Sahitya Parisat, 1362, pp. xiii,

——— Emerson. Pradip, Vol. IV, no. 7, Asad, 1308, pp. 240 - 247.

——— Emerson. Vangadarsan (Nava-Paryay), Vol. III, no.7, Kartik, 1310, pp. 323 - 331 (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Gitiguccha: Svadesi Gan, Brahma Sangit. Visva Bharati Patrika. Kartik - Pous, 1958. Svadesi Gan -1,2; Brahma Sangit. 3, 4, 5, 6.

——— Gota Tin, Kathin Katha, Vangadarsan, Vol. VIII, no. 2, Jaistha, 1315, pp.71 - 78; no.4, Sravan, 1315, pp. 175 - 179; no. 5, Bhadra, 1315, pp. 245 – 248 (written in the prison).

——— Hindu Musalman Antat. Vangavani, Sravan, 1330 (Vaithaki Katha).

——— Hindu Sraddher Artha O Adhikar, Narayan, 2nd Yr, Vol. I, no. 2, Pous, 1322, pp. 125 - 148.

——— Jabardastir Lekhapada. Vangadarsan, Caitra, 1318.

——— Jay Radhe Govinda Vala. Radha Govinda. Pravahini, Sravan, 2, 1321.

——— Jirnatari. Vangadarsan (Nava-Paryay), Vol. VI, no.I, Vaisakh, 1313, p. 42. (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Jivan, Vima Vijnan-Paricay. Matribhumi, Vol. II, no. 11, Agrahayan...... pp. 682-687: Vol. II, no. 12, Pous....... pp. 745 - 749.

——— Ka Pantha ? Navya-Bharat, Agrahayan, 1328.

——— Kangresi Katha. .....Vangadarsan (Nava-Paryay), Vol. VI, no. 8, Agrahayan, 1313, pp. 377-385.

——— Kangreser Katha, Vangadarsan, Vol. VIII, no.I, Vaisakh, 1315, pp. 44-49.

——— Karanka, Vangadarsan, Magh, 1319.

——— Kavitar Kastipathar. Narayan, vol.ii, no.4, Bhadra, 1322, pp. 1007 - 1032.

——— Kavyer Prakas. Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. VI, no. 4, Sravan, 1313, pp. 178-180 (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Lokasiksa O Samaj Prakriti. Vangadarsan, Pous, 1319.

——— Mahajan Padavali O Rasakirtan, Narayan, 2nd Yr., Vol.I, no. 5, Caitra, 1322, pp. 505-515.

——— Mahajan Siddhante Purus O Prakriti. Narayan, 3rd Yr., Vol. I, no. 5, Caitra, 1323, pp. 379-386.

——— Mahajan-Pader Isvar-tattva, Narayan, 3rd Yr., Vol. I, no. 4, Phalgun, 1323, pp. 317-325.

——— Matr-tarpan, Vangadarsan, Jaistha, 1335, p. 541.

——— Mouni, Vangadarsan (Nava-parvay), Vol. VI, no. 10, Magh, 1313, p. 516 (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Mrinaler Katha. Narayan. Vol. I, no. 1. Agrahayan, 1321, pp. 20 - 56.

——— Nesan Va Jati. Vangadarsan (Nava-paryay). Vol. VI, no.3, Asad. 1313. pp. 105-110; no. 4, Sravan, 1313, pp 169-173.

——— Svaissi va patriotism Pravandher Anuvritti.

——— Navajivaner Adarsa. Vangadarsan (Nava-Paryay), Vol. IV, no. 11, Phalgun, 1311, pp. 578-584.

——— Narayan. Narayan. 4th Yr., Vol. I, no. 1, Agrahayan, 1324, pp. 1-4.

——— Natya Kala O Rasatattva. Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. VI, no.1, Vaisakh. 1313, p. 1-6.

——— Nutane Puratane. Narayan, Vol. I. no. 1, Agrahayan, 1321, pp. 5-19.

——— Patra O Citra. Narayun, 6th Yr., Vol. I, no 4, Phalgun, 1326, pp.324-334; no. 5, Caitra. 1326, pp. 491-500; no 6, Vaisakh, 1327, pp. 530-540; no. 7, Jaistha, 1327, pp. 655-662

——— Panthapadap. Vangadarsan (Nava-paryan), Vol. VI, no. 1, Vaisakh, 1313. p. 42 (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Piriti. Narayan. Jaistha, 1323

——— Pralay. Vangadarsan (Nava-paryay), Kartik, 1312, (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Pradesik Samiti. Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. VI, no. 12, Caitra, 1313, pp. 582-589.

——— Praner Katha, Vangadarsan, (Nava-paryay), Vol. VIII, no. 8, Agrahayan, 1315, pp. 413-420.

——— Purvaraj. Narayan, Asad, 1323.

——— Pujari. Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. VI, no.1, Vaisakh, 1313, p. 42, (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Raser Pathe. Pravahini, Sravan 23,1321.

——— Radhikar Prem. Alocana, Vol. II, 1885-86.

——— Rager Pathe. Samhati, Vaisakh - Asvin, 1331.

——— Raja O Praja. Vangadrsan (Nava-paryay), September - October, 1905.

——— On Queen’s proclamation issued on November 1, 1858.

——— Rajbhakti, Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. VII, no. 4, Sravan, 1314, pp. 204-208.

——— Rajdharma. Bhandar, Vol. I, no.1, Vaisakh, 1312.

——— Rastriya Bharat - Hindu O Musalman. Vangavani. Asvin, 1330. (Vaithaki Katha).

——— Rumer Badsah O Bharater Musalman Samaj. Vijaya, Agrahayan, 1319.

——— Rup. Narayan, Asad, 1323.

——— Sayyasabhar Vaktrita. Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. VI, no. 6, Asvin, 1313, pp. 314-316 (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Samasamayik Katha, Navya-Bharat, Vaisakh, Asad - Kartik, 1329.

——— Samaj- Sakti. Alocana, Vol. II, p. 3-15.

——— Sandhyar Ekti Sur. Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. II, no. 12, Caitra, 1309, p. 675-676 (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Sanyas. Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. VI, no.7, Kartik, 1313, pp. 368. (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Sattar Vatsar. Pravasi. Magh, 1333 - Vaisakh, 1335.

——— Sahitye “Rupantar” Narayan, 3rd Yr., Vol. II, no.3, Sravan, 1324, pp. 722-728.

——— Samya O Anupat. Alocana, Vol. II, pp. 59-65.

——— Samyavad O Samya Sadhan. Sahitya, Vaisakh, 1329.

——— Sarthak, Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. VI, no.3, Asad, 1313, pp.124-125.

——— Asiksa O Kusiksa. Vangadarsan, Phalgun, 1318.

——— Sivaji-Utsav. Vangadarsan (Nava-paryay), Vol. VI, no. 5, Bhadra, 1313, pp. 235-243.

——— Sivaji Utsav O Bhavanimurti, Vangadarsan (Nava-paryayn), Vol. VI, no. 6, Asvin, 1313, pp. 296-305.

——— Sraddher Katha, Vijaya. Sravan, 1321.

——— Sri Krsna. Pravartak, Phalgun, 1329; Vaisakh, Jaistha. Sravan, 1330.

——— Sri Sri Krsna tattva. Narayan, Vol. I, no. 2, Pous, 1321, pp. 85 - 200; пo. 3, Magh, 1321, pp. 293 - 301; no. 4, Phalgun, 1321, pp. 317 - 323; пo. 5, Caitra, 1321, pp. 505 - 512; Vol. II, no. 1, Jaistha, 1322, pp. 769 - 777; no. 2, Asad, 1322, pp. 850 - 863; пo.3, Sravan, 1322, pp. 987-1004; no. 4, Bhadra, 1322, pp. 1105 -1122; 2nd Yr., Vol. I, no. 1, Agrahayan, 1322, pp. 118 -122; пo. 3, Magh, 1322, pp. 313-319; Phalgun, 1322, pp. 420 - 432; no. 5, Caitra, 1322, pp. 544 - 548; no. 6, Vaisakh, 1323, pp. 670 - 680.

——— Syamameva Param Rupam. Narayan. Asad. 1325.

——— Sukumar Sahityer Prakriti. Navajivan, Magh-Caitra. 1293.

——— Sundar O Saundarya. Asa, Vol. II, no 1, Magh 11, 1893 (1300 B.E.)

——— Sekal O Ekal. Vangadarsan. 7th Yr., no 5, Bhadra, 1314, pp 231-234 (Written under the pseudonym “Sri”.

——— Svades. Vangadarsan (Nava-paryay), Kartik, 1312, (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Svadharma O Paradharma. Pravasi. Agrahayan, 1317.

——— Svaraj O Annasamasya. Masik Vasumati. Vol. III-I, no. 5, Bhadra, 1331, pp. 710-713.

——— Svarupopasana Sampadupasana O Pratikopasana. Vangadarsan, Vol. VIII, no. 6, Asvin, 1315, pp. 314-316

——— Svadhinata O Paradhinata. Navya-Bharat, Asvin, 1328.

——— Taducit Gaurcandra. Narayan. 2nd Yr., Vol. I, no. 6, Vaisakh, 1323, pp. 549-571.

——— Upanayan, Vangadarsan (Nava-paryay), Kartik, 1312 (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Vartaman Hindu Dharmer Devavad O Devopasana. Narayan, Vol. I, no. 4, Phalgun, 1321, pp. 362-368.

——— Vaya Kaisorakam, Vaya. Navya-Bharat, Agrahayan, 1329.

——— Vamalir Valyakrida O Tahar Visamay Phal. (Pratham Prastav). Alocana, Vol. I, pp. 111,112.

——— Vamgalir Pratima Puja O Durgotsav. Narayan, Vol. II, no. 6, Kartik, 1322, pp. 1227-1251.

——— Vamgalir Vaisnavadharma. Alocana. Vol. I, 1884-85 (Wrtten under the pseudonym “Sri” Premadas Vavaji - In the index it was included in the works of Bipin Chandra Pal).

——— Vamlar Navayug. Sonar Vamla, Vol. I, no. 23, Bhadra 29, 1330, p. 10.

——— Vamiar Navayuger Katha. Vangavani, Vol. II, no.1, Bhadra, 330, pp. 70 -78; Vol. III, no. 1, Jaistha, 1331, pp. 406-413; Vol. III, no. 4, Asvin, 1331, pp. 164-169.

——— Vanga - Vibhag. Vangadarsan (Nava-paryay). Kartik, 1312 (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Vilater Sramajivi. Bharati, Vol. XL VII, no. 5, Bhadra, 1330, p. 460.

——— Vilater Sramajivi, Madhukari Praci, Vol. I, no. 1, Asad, 1330, pp. 57-59.

——— Narayan, 2nd Yr., Vol. I, no. 4, Phalgun, 1322, pp. 321-334.

——— Vaisnav Kavitar Rasagrahan. Pravahini, Sravan, 16, 1321.

——— Vaisnav Mahajan O Vamgala Mahajan-Pad. Narayan, 3rd Yr., Vol. I, no. 3, Magh, 1323, pp. 171-198.

——— Vande Mataram, Dharma, Magh 11, 18, 1316.

——— Vyakti O Samaj. Navya-Bharat, Bhadra-Asvin, 1332.

——— Vyanka Sancay O Jivan Vima. Desapriya Patrika, Phalgun 26, 1346.

——— Vra Vangadarsan (Nava-paryay), Kartik, 1312 (Written under the pseudonym “Sri”).

——— Yausvaner Katha. Samhati, Vaisakh, Jaistha, Sravan, 1331.

——— Yauvaner Sadhan. Navya Bharat, Pous, 1329.

——— Yauvaner Svarajya. Navya Bharat, Magh, 1329.

——— Yauvaner Tane. Pravahini, Bhadra 5, 1321.

Bipin Chandra Paler Mantavya:

Ami Ardha Grihi Ardha Sanyasi. Kal Ki Habe Sejanye Aj Sancay Karina ——————— Amar vivek Vadhche Vale e Artha (Rs. 8000-Fund Collected for him) Ami Grahan Karte Parvana ——————— Ai Priti Upahar Apnader Hate Pratyarpan Karchi. (Mukhopadhyay, Viplavi Jivaner Smriti, 1963, p.322).

ARTICLES ON BIPIN CHANDRA PAL

——— Ali, Asaf, *Late Babu Bipin Chandra Pal*, Hindu, Vol. VII, no. 8, June 4, 1932, p. 32.

——— Amrit Bazar Patrika, Calcutta, October 9, 1911. Editorial Comment. In reply to **The Statesman** and in defence of Pal.

——— May 14, 1918 (The) World-situation (Main editorial) Bipin Chandra Pal’s views on international politics.

——— February 25, 1920 Editorial comment (Rebuffing Sydenham).

——— May 21,1932 (A) Note on Pal’s life.

——— May 21,1932 Bipin Chandra Pal (editorial).

——— Sri Aurobindo, Bipin Chandra Pal “the foremost man among us”. (In ‘A Great message’). Bande Mataram, March 12, 1908.

——— Bipin Chandra-the prophet of a great political creed. **Bande Mataram** (weekly ed.) March 8,1908, Leader “A Great Opportunity”.

——— Sri Aurobindo. (The) Glory of God in man (Bipin Chandra Pal): editorial. **Bande Mataram** (weekly ed.) March 1,1908.

——— (A) Great Message. **Bande Mataram,** March 12, 1908, (weekly ed.) March 15,1908. Two issues on Bipin Chandra Pal.

——— Banerjee, J.L (A) Born Rebel. **The Statesman,** May 21, 1932.

——— (The) Bengalee, March, 30, 1921. *Exit Babu Bipin Chandra Pal* (editorial).

——— March 31, 1921. *Mr. Pal and the situation* (editorial).

——— May 14.1925. *Mr. Bipin Chandra Pal* (editorial).

——— June 11,1925. Mr. Bipin Chandra Pal and Swarajist activities (editorial).

——— (A) *Britisher, Mr. B. C. Pal and the future of India.* The Manchester Guardian, September 20, 1911. (A) Letter written to the Manchester Guardian.

——— Brockway, A. Fenner (The) Truth about India: Interview with *B. C. Pal, Labour Leader*, March 17,1911.

——— **Calcutta Evening News** (The Bengalee), May 23, 1932, *Mr. Bipin Chandra Pal* (editorial).

——— Chattopadhyay, Birendranath, Letter to the editor, **The Times,** London, March 1, 1909. In defence of Bipin Chandra Pal.

——— Letter to the editor. **The Times,** London, July 12, 1909. On aims and objects of B. C. Pal’s “Swaraj”.

——— Correspondent, **Amrita Bazar Patrika,** London. Reports and comments on Pal’s London Speeches. **Amrita Bazar Patrika,** January 6, 1899; February 15,1899.

——— **(The) Daily News,** London, November 28, 1907, Report and comment on Bipin Chandra Pal. Reprinted in India, London, December 6, 1907.

——— Das, Chittaranjan, Letter to Bipin Chandra Pal, **Amrita Bazar Patrika**, November 14,1923.

——— Das, Sundari Mohan, Bipin Chandra Pal - his inner man. **The Amrita Bazar Patrika**, May 24, 1932.

——— **(The) Englishman,** October 22, 1932. *Mr. Bipin Chandra Pal's manifesto* (editorial).

——— May 7,1924. *Mr. Pal and Mr. Gandhi* (editorial).

——— **Forward,** November 24, 1925. Logic versus facts (editorial). *Criticism of Bipin Chandra Pal.*

——— Home, Amal. Bipin Chandra Pal: Politician, Orator, Journalist. **Amrita Bazar Patrika,** November 6, 1958.

——— **Indian Daily News,** Calcutta, August 27. September 11,13,18; November 21,1907. *Bipin Chandra Pal's involvement in "Bande Mataram" prosecution case.*

——— *Indian Social Reformer,* Madras, Vol. XII, no. 2, September 8, 1901. (A) Felicitation to Pal.

——— James, Frederick. *Bipin Chandra Pal.* Vigil, Vol. IX, no. 40, (New Series) November 8, 1958.

——— Krishna Verma, Shyamaji. Letter to the editor. **The Times,** London, March 10,1909. He quotes Pal in support of his contention.

——— **Liberty,** Calcutta, May 21, 1932. Bipin Chandra Pal (editorial).

——— Manchester Guardian's Calcutta correspondent. Reports and views on Pal. **Manchester Guardian,** January 22, 1907.

——— Mitter, P.C. (A) Clear thinker, **The Statesman,** May 24, 1932.

——— **(The) Modern Review,** Vol. II, no. 6, June, 1932 Notes: Bipin Chandra Pal.

——— **Morning Leader,** London, October 11, 1911. Mr. B. C. Pal's sentence (editorial note).

——— Nehru, Jawaharial. Speeches at Pal's Birth Centenary held in Delhi in 1958. **Hindustan Standard,** November 8, 1958.

——— Pal, Jnananjan. Bipin Chandra Pal (*in 'Studies in the Bengal Renaissance*', edited by Atul Chandra Gupta, 1958 pp. 556 - 580).

——— **(The) Pioneer,** Allahabad, December 22, 1919: Editorial comment*. An attack on Bipin Chandra Pal's views on Bolshevism*.

——— Ray, Manindra Narayan (A) Prophet and a pioneer, **Hindustan Standard,** November 2, 1958.

——— Reynolds, Fred. Letter to the Manchester Guardian.

——— Supporting Mr. Pal's political views. Reprinted in **The Indian Mirror,** December 21, 1898.

——— Sengupta, Jatindra Mohan & others. Wire to Bipin Chandra Pal - March 5, 1924. **Amrita Bazar Patrika,** March 12, 1924.

——— Singh, Sant Nihal. Bipin Chandra Pal: Boycotter. **The Review of Reviews,** Vol. XXXIX, Jan-June, 1909.

——— *Bipin Chandra Pal: Reminiscences of the patriot in voluntary exile.* The **Modern Review,** Vol. III, no. 1, July, 1932.

——— **Standard Bearer,** Vol. II, no. 12, November 14, 1921. *What India thinks* - (an analysis of Pal's political views) - editorial.

——— **(The) Statesman,** Calcutta, October 8, 1911. *Criticism: Stringent Punishment of Pal.*

——— March 30, 1921. *Bipin Chandra Pal's Barisal* - speech (editorial).

——— February 27,1924. Editorial (Supports Pal against Swarajist politics).

——— May 7, 1924. Editorial (Pal's views on industrial policies and tariff measures).

——— Stead, W. T. Bipin Chandra Pal: Nationalist - imperialist. **The Review of Reviews,** Vol. XI, IVv, no. 262, October, 1911.

——— On Swaraj case. Reprinted in Karmayogin, Vol. I, no. 19, Kartik 27,1316.

——— Tagore, Rabindranath. Letter to Bipin Chandra Pal (in Bengali) Phalgun 30, 1333. Unpublished personal collection of Jnananjan Pal. In connection with International Brotherhood (Mookerjee, Amalendu Prasad: Social and Political Ideas of Bipin Chandra Pal, p. 172)

——— **(The) Times,** London, June 3, 1907. (A) Correspondent's lengthy letter. Excerpts from Bipin Chandra Pal's speech delivered at Madras.

——— June 3,1907. Editorial (*Criticism of Bipin Chandra Par's Madras speech*)

——— June 19, 1907. Editorial (*Bipin Chandra Pal's Sakti Poojah speech*).

——— June 19, 1907. *Critical report of Bipin Chandra Pal's speech on "Sakti-Poojah".*

——— July 8, 1909. *(The) Extremist attitude* - a report by its correspondent. Bipin Chandra Pal's "Swaraj" and implication with Savarakar's activities.

——— August 18, 1909. Indian sedition (editorial note on Bipin Chandra Pal and Surendranath Banerjee).

——— August 24, 1909. Prosecution of the “Swaraj” -e report

——— September 21, 1909. Indian sedition-report on the prosecution of ‘Swaraj - Bombay agent.

——— January 2, 1920. (The) Bolsheviks in Central Asia (editorial). Criticism of Bipin Chandra Pal’s views on Bolshevism.

——— May 21,1932. Obituary: Bipin Chandra Pal.

——— (The) World and the New Dispensation, Vol. X, no. 26, June 25, 1899 Notes and comments on Pal.

——— April 21,1921. (The) Coming and passing of logic - Dom. (editorial).

ARTICLES ON BIPIN CHANDRA PAL IN BENGALI

Ananda Patrika, November 7, 1958. *Sampadakiya: Bipin Chandra Pal*. Bhattacarya, Arani Kumar, *Srihatter Durgavadi*. Pravasi. Vol. XXVII. pt. II, no. 6, Caitra, 1334, p. 659. Discussion on “*Sattar Vatsar, Bipin Chandra Pal* published in Pravasi, Asad, 1334.

Cakravarti, Yogindra Candra. *Sivaji-Utsav*. Vangadarsan, Vol. VII, no. 6, Asvin, 1314, p. 267276. Criticism of the article “*Sivaji Utsav O Bhavanimurti*” by Bipin Chandra Pal-published in the Vangadarsan.

Caudhuri, Eklimur Raja. *Srihatter Sambhranta Mussalman Parivar*. Pravasi, Vol. XXXVII, pt. II, Agrahayan, 1334, p. 212-213. *Discussion on “Sattar Vatsar”* by Bipin Chandra Pal, published in the Pravasi, Asad, 1334.

Dasgupta, Kartik. *Vipiner Karamukti*. Sandhya, 1st Caitra Sanivar, 1324. (A poem).

Datta, Bhavatos. *Bipin Chandra Pal*. Visva Bharati Patrika, Kartik - Pous, 1958.

Ghos, Varindra Kumar. *Sarvajana Varanye Bipin Chandra*. Yugantar, November 23,1958.

Ghos, Varma Saraccandra. *Bipin Babur Ka Pantha*? Navya - Bharat, Magh, 1328.

Gupta, Pavitra. Svarajer *Tirthapathe Nihsanga Pathik Bipin Chandra Pal*. Serial in **‘Jayasree’** Bengali periodical in a regular issue since 1414 B.S. (being serial no. 19 published in Asad, 1414).

Pal, Sasibhusan. *Agradani O Acarya Brahman*. Pravasi, Vol. XXXVII, pt. I, no 1, Vaisakh, 1334, p. 124.

Discussion on “Sattar Vetsar: Bipin Chandra Pal”. Published in the Pravasi, Magh, 1333.

Pravasi, Vol. XXXII, no. 1 (3), Asad, 1339; p. 435 - 437.

Svargiya Bipin Chandra Pal (Vividha Prasanga). Illustrated.

Vol. XXXVIII, pt. I (no. 5). Bhadra, 1345: p. 739. *Bipin Chandra Paler Smrti. Raksakalpe Rastar Namkaran Prastaver Virodhita*. (Vividha Prasanga).

Sanyal, Manmatha. *Svadesik Mantrer Udgata Manisi Bipin Chandra*. Ananda Bazar Patrika, November 9, 1958.

Vagci, Dvijendra Narayan. *Barisal Sammelan O Bipin Babu* - Bharati, Vaisakh, 1328.

Vasu, Nirmal Kumar. *Bipin Chandra Pal*. Visva Bharati Patrika, Kartik - Pous, 1958, p. 170.

Bijoy Dev : Bijoy Dev plunged in to the soundless ocean of words of the Library Science in the beginning of his career and rendered service to his chosen field in the Gurucharan College, Silchar (1951-60), the Jagadbandhu Institution, Ballygunge, Calcutta (1961-63) and the National Library, Calcutta (1963-92).

A keen student of world literature, he did his Ph.D. on ‘Absurd Drama : Its Growth and Development in European Literature and Its Impact on Bengali Dramatic Literature’, which is a noteworthy contribution to the field of comparative literature, nay, dramaturgy.

His write-ups and articles on European and Afro-Asian literature, particularly, English, French, German, Italian, Greek, Arabic, Palestine, African etc. used to appear regularly in newspapers and periodicals.

1970 marked his debut as a writer when his collection of Bengali short stories, ‘Kuruksetrer Prangna’ was published. His important publications include critical appreciation of Jean Paul Sartre’s existentialist novel in an anthology, ‘Prasanga Jean Paul Sartre’, ‘Rabindranath O Absurd Natak’, ‘Leonardo Da Vincir Galpamala’ and ‘Sudhindranath Dutta - Pratiker Dipti.’ He has already published a select bibliography on Bipin Chandra Pal. His forthcoming publication for the Kolkata Book Fair of 2009 is a book on the major post-Tagorean poets of Bengal.

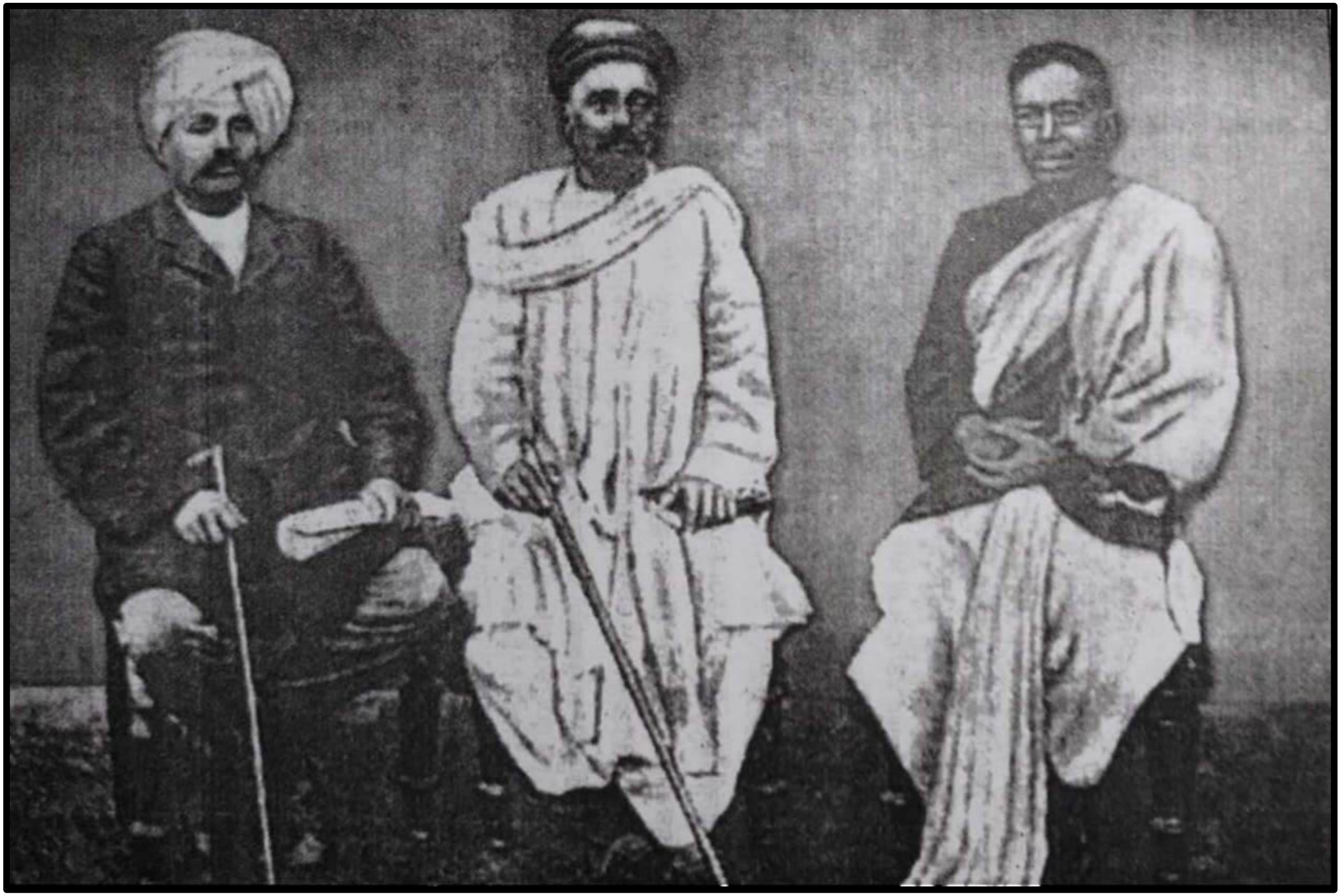

লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল

কর্মে ও মননে বিপিনচন্দ্র ও গান্ধি

সন্দীপ দাস

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বিপিনচন্দ্র পাল এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। শিক্ষায় নিতান্তই নগণ্য, কিন্তু প্রজ্ঞার গভীরতায় ও দূরদর্শিতায় এবং প্রকাশভঙ্গির দীপ্তি ও ঋজুতায় তিনি ছিলেন অনতিক্রমণীয়। নৈতিকতায় ও আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের বিশ্বাসে অনমনীয় বিপিনচন্দ্রের জীবনে জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠার যেমন সুযোগ ঘটেছে, তেমনি জনমানসে তাঁর সম্পর্কে যেভাবে বিস্মরণ ঘটেছে, তার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে দেশ জোড়া যে জাগরণ তার অন্যতম অগ্রনায়ক ছিলেন বিপিনচন্দ্র। লাল-বাল-পালের সেই যুগকে চিত্রিত করতে তাঁদের অবদান বিষয়ে নানা মনীষী, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকরা বিভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন। একান্ত গান্ধি অনুসারী, সচিব ও জীবনীকার প্যারীলালের ভাষায়, ‘এই নতুন জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক ছিলেন পাল, লাল শৌর্য ও সাহসের প্রতীক আর বাল ছিলেন তার হৃদয় ও আত্মা।’[১] বিপিনচন্দ্রের মাদ্রাজ ভাষণাবলীর প্রতিবাদে বিমুগ্ধ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কথায়, ‘বাগ্মিতার এই সাফল্য ভারতে স্বপ্নের অগোচর ছিল। মুখের ভাষায় এই উত্তরণ কখনো ঘটেনি।’[২] স্মরণযোগ্য যে, এঁরা দুজনেই বিপিনচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন না। ১৯০৮ সালের মার্চে তাঁর কারামুক্তিতে (অরবিন্দ মামলায়) শুধু বাংলা নয়, দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে মাদ্রাজে অভিভূত জনগণ যেভাবে সভা, শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জা, দরিদ্রদের খাওয়ানো এবং তাঁর কর্মযজ্ঞে সমর্থন হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তা ছিল এযাবৎকাল নজিরবিহীন।[৩]

বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিমানসকে বুঝতে গেলে তাঁর ওপর কৈশোর থেকে যেসব প্রভাব পড়েছিল তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রারম্ভেই করতে চাই। প্রথমটি পারিবারিক, দ্বিতীয়টি তাঁর কলকাতার ছাত্রজীবনের, বিশেষ করে একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, হেম-নবীন, মধুসূদনের লেখনীতে জাতীয়তার উন্মেষ, অন্যদিকে তাঁর শ্রীহট্টীয় মেসের গণতান্ত্রিকতা ও নিয়মানুবর্তিতা।[৪] প্রবহমান জাতীয়তাবোধ, ব্রাহ্ম প্রভাবে কুসংস্কার অপনয়নের প্রয়াস এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ এবং সর্বোপরি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বৈষ্ণব আন্দোলনের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মারিমা-বোধ থেকে মুক্তির ভাবনা। ৭৪ বছরের জীবনে এই ধারাগুলির ঘাত প্রতিঘাতে সবসময়ে যে তাঁর কর্মপন্থা তিনি যথার্থভাবে নির্ণয় করেছেন, তা হয়তো নয়।

মোহনদাস গান্ধির ভাবনা ও জীবন পরিক্রমার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা করার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখা উচিত। বিপিনচন্দ্র গান্ধির চেয়ে এগারো বছরের বড়ো হলেও নানা সূত্রে গান্ধির সঙ্গে মালব্য, গোখলে, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, লাজপতরায় এবং চিত্তরঞ্জনের যে ব্যক্তিগত সান্নিধ্য গড়ে উঠেছিল, তা বিপিনচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সংগ্রামের সমর্থনে গান্ধি একাধিকবার ভারতে এবং কলকাতায় এসেও অনেক বরিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এলবার্ট হলে বিদ্বজ্জনের সভায় বক্তব্য রেখেছেন। ১৯০২ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। স্বকীয় উদ্যোগে প্রতিনিধি-নিবাসকে পরিচ্ছন্ন করতে যে প্রয়াস নিয়েছেন, তাতে অনেকেই আশ্চর্য হয়ে দেখেছেন।[৫] আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরেছেন। সুরেন ব্যানার্জির সঙ্গে তখন তো দেখা করতেনই, যখন দেশবন্ধু বাংলায় তাঁর ভরসা, তখনো দেশবন্ধুর পথের বিরোধী সুরেন ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। ১৯০৯ সালেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি রূপে তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়।[৬] কিন্তু বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সে সময় তাঁর সংযোগ ঘটেছে বলে কোন নজির পাইনি।

লন্ডনে বিপিনচন্দ্রের অবস্থান কালে (সেপ্টেম্বর, ১৯০৮-১৯১১) গান্ধির সঙ্গে তাঁর সংযোগের তথ্য পাওয়া যায়। তিনি লন্ডনে যাওয়ার কিছুদিন পরেই আনন্দকুমারস্বামীর সভাপতিত্বে ভারতীয়দের এক সভায় দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধির গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র, সাভারকার, খাড়পাদে প্রমুখ বক্তারা এই ঘটনাকে ‘বিশ্বাসভঙ্গ বলে অবিহিত করেন’।[৭] গান্ধির সঙ্গে একই সভায় বিপিনচন্দ্রের উপস্থিতির উল্লেখ পাই লন্ডনে বিহার প্রাদেশিক মুসলিমলিগের সভাপতি সৈয়দ আলির সংবর্ধনায় (১৯০৯)। সেখানে বিপিনচন্দ্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর জোরালো বক্তব্য রাখেন। কারামুক্তির পর লন্ডনে এসে গান্ধি সেই সভায় বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন।[৮] লন্ডনেই পরবর্তী অন্য এক সভায় (৬.১১.০৯) পশুশক্তির চেয়ে আত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে বক্তব্য রাখেন। বিপিনচন্দ্র সেখানে বলেন এবং আত্মিক শক্তির সঙ্গে দৈহিক শক্তির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রতিক্রিয়ায় আবার গান্ধি বলেন, তাকে তাহলে আত্মিক শক্তি বলা যাবে না।[৯]

১৯১৬ সালে অম্বিকা চরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌতে যে ঐতিহাসিক কংগ্রেস হয়, তার মূল সুর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। সেখানে বিপিনচন্দ্র, তিলক সকলেই লক্ষ্ণৌ চুক্তি সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। স্থায়ীভাবে ভারতে চলে এসে গান্ধি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং এখানেই তাঁর চম্পারণ যাওয়ার যোগাযোগ হয়।[১০]

১৯১৯ সালে বিশেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মালব্য সভাপতিত্ব করেন। মডারেটরা তাতে যোগ দেন নি। অ্যানি বেসান্ত, তিলক, পাল, মতিলাল, জয়কার প্রমুখ মন্টেন্ড চেমসফোর্ড রিফর্ম নিয়ে আলোচনা করে তার কয়েকটি ইতিবাচক দিক মেনে নিয়ে তাকে অনুপযুক্ত ও হতাশাজনক বলেন। অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত গান্ধির এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল, কিন্তু বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, তা তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে নি। মনে হয়, গান্ধির সঙ্গে বিপিনপালের যে গুরুতর মত পার্থক্য ১৯২০-২১ সালে ঘটেছিল, যা থেকে বিপিনচন্দ্রের বিপুল প্রভাব হতে থাকে, তা আলোচনা করার আগে ১৯০৮ সালে বক্সার কারাবাস এবং কারামুক্তির পর বিপিনপালের মনোজগতে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তার করা যায়।

বিপিনচন্দ্র নিজেও স্বীকার করেন যে মাদ্রাজ বক্তৃতাবলীতে তিনি বিচ্ছিন্ন সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনীয়তার কথাই বলেছিলেন, যদিও স্বদেশী প্রচারে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ যে সর্বজনীন মানবতা, তারও উল্লেখ করেছেন।[১০] কারামুক্তির কিছুকাল পরই শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা প্রমুখ মুক্তিপাগল ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয়রা বার্ষিক হাজার টাকার সম্মান দক্ষিণায় তাঁকে কয়েক বছর ধরে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। আমন্ত্রণকারীরা ছিলেন স্বতন্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। ১৯০৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্র স্বশস্ত্র প্রতিরোধ ও বোমাব্যবহারের অনৈতিকতা ও অসারতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলে এঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। কৃষ্ণভার্মা তাঁর সম্পাদিত ‘ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট’ সাময়িকপত্রে তাঁকে ভারতীয় স্বধর্মত্যাগীর প্রতীক বলে অভিহিত করেন।[১১] বিপিনচন্দ্র তিনবছর ইংল্যান্ডে থেকে ইংল্যান্ডবাসী অনেককে খুঁজে পান যাঁরা ভারতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত, কিন্তু সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার উর্ধ্বে। তাঁর এই অবস্থানকালে প্রথমে ‘স্বরাজ’ ও পরে ‘ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট’ নামে দুটি সাময়িকপত্রও প্রকাশ করেন। বস্তুত সেই সময় থেকে তাঁর ভাবনা অনেকটা মডারেটদের কাছাকাছি চলে যায়।[১২] জনমানসে ১৯০৬-০৮-এর পরিপূর্ণ স্বরাজের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বিপিনচন্দ্র ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে স্বরাজ অর্জনে প্রয়াসী হয়েছেন, এই ভাবনা গড়ে উঠতে থাকে। ‘ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট’ পত্রিকায় তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে লিখলেন, কুসংস্কার কিংবা আবেগ নয়, যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে হবে।[১৩] উল্লেখ্য যে, চরমপন্থীদের ভাবনা সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন, ওরা যুক্তি শোনে না, অলৌকিকভাবে স্বরাজ চায়। সেই সময় রাষ্ট্রগুরু, যাঁকে ‘Surrender not’ বলে লোকে বরণ করত তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলত ‘Sir, surrender not ।[১৪] বিপিনচন্দ্র কিন্তু কোনো সরকারি খেতাব নেননি, কিন্তু ২০-২১ সালে বলেছেন, গান্ধি ম্যাজিক দিয়ে স্বরাজ আনতে চান, আমি লজিক দিয়ে স্বরাজের কথা বলছি। বস্তুত স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৬-১৯০৮) বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যে সারবত্তা যথেষ্ট থাকলেও তাতে কি কোন ম্যাজিক ছিল না, শুধুই কি লজিক ছিল? রাজনীতি কি শুধু লজিকের পথ ধরে চলে! মনে হয় শুধু আবেগ সর্বস্ব নয়, কিন্তু নেতা যদি বৃহদংশ মানুষের আবেগকে মর্যাদা দিতে পারেন, তাহলেই তাঁর নেতৃত্ব সফল হতে পারে। উল্লেখ্য যে, বিপিনচন্দ্রের ভাবধারা জনমানসে প্রচার করতে ও পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে যাঁর ভূমিকা সর্বাধিক, তাঁর সুপুত্র সেই জ্ঞানাঞ্জন পালও অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন।[১৫] ১৯২০-২১ সালের ঘটনা প্রবাহের উল্লেখ থেকে গান্ধি ও পালের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। অমৃতসর কংগ্রেসে (১৯২০) মন্টেন্ড-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের ওপর বিতর্কে পাল গান্ধির কাছে সংস্কার আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে বললে তিনি বলেন, ‘যদি আমি বলি যে সংস্কার আইনের খসড়া হতাশাজনক তবে তার অর্থ দাঁড়াবে আমি তা প্রত্যাশা করিনি। পালের এই বক্তব্যে আমি সহমত। তবে এই সম্পর্কে আমার নিশ্চয়ই বক্তব্য আছে, বিশেষত মূল খসড়ার ‘থেকে পরিবর্তিত আকারের বিধেয়ক থেকে। এই মুহূর্তে তার বন্ধুগত পরিবর্তন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে আমি প্রস্তুত হইনি।’ এই কংগ্রেসে গান্ধির সঙ্গে তিলক, দাশ, পালদের ভোটাভুটির

সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিলক, দাশ প্রমুখ গান্ধির সঙ্গে সমঝোতা করায় সর্বসম্মত প্রস্তাব হয়।[১৬]

ইতিমধ্যে গুজরাত রাজনৈতিক সম্মেলনে গান্ধি অসহযোগের প্রশ্নব পাশ করিয়ে তার সপক্ষে প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। তারপর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। শুধু অসহযোগের প্রশ্নে সিদ্ধান্তের জন্য। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপত রায়। উপস্থিত ছিলেন ২০,০০০ প্রতিনিধি ও সহযাত্রী। সম্মেলন ৪-৯ সেপ্টেম্বর। গান্ধি অসহযোগ প্রস্তাব উত্থাপিত করে, সরকার প্রদত্ত উপাধি, মনোনীত সদস্যপদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও আদালত বর্জন, কাউন্সিল বর্জন, বিদেশী পণ্য বর্জন প্রভৃতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং অসহযোগের লক্ষ্য স্বরাজ বলেও অভিমত প্রকাশ করেন। বিপিনচন্দ্র তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে স্বরাজের রূপরেখা অস্পষ্ট, খিলাফতকে যুক্ত করা, কাউন্সিল বর্জন এবং এখনই বিদ্যালয় ও আদালত বর্জনের বিরোধিতা করেন। অবিলম্বে এক প্রতিনিধিদল বিলেতে গিয়ে আমাদের ন্যায্য দাবি পেশ করুক, চিত্তরঞ্জন পালের এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। বেসান্ত, মালব্য, কস্তুরিরঞ্জন এই সংশোধনী সমর্থন করেন। সভাপতির কঠোর ব্যবস্থায় ভোটাভুটি হয়, তাতে মূল প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৫৫, সংশোধনীর পক্ষে ৮৭৩ জন ভোট দেন। গান্ধি তাঁর জবাবি ভাষণে সংখ্যাগরিষ্ঠও সংখ্যালঘুদের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং সংখ্যালঘুদের যতদিন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠকে স্বমতে না আনতে পারেন, ততদিন যেন তাঁরা গৃহীত প্রস্তাবের সঙ্গে সহযোগিতা করেন বলে আবেদন জানান। উল্লিখিত তিনটি সম্মেলনই ২০ সালের।[১৭] ২০ সালের ডিসেম্বরের শেষে কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয় নাগপুরে। চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে বাংলা থেকে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি যান অসহযোগকে বিরোধিতা করতে। সম্মেলনের আগে গান্ধির সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের দীর্ঘ আলোচনা হয়। ‘গান্ধি ম্যাজিকে’ চিত্তরঞ্জন তাঁর মত পরিবর্তন করে সম্মেলনে অসহযোগের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তা গৃহীত হয়। বিপিনচন্দ্র নি:সঙ্গ বোধ করেন এবং চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন করেন। চিত্তরঞ্জন বিপিন পালকে নানা ভাবে আর্থিক সাহায্য করতেন। কিন্তু এরপর বিপিনচন্দ্র তাঁর কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন। বিপিনচন্দ্র পরে লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের আত্মিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল।

চিত্তরঞ্জন এই কংগ্রেসেই তাঁর সুবিশাল আইন ব্যবসা ত্যাগ করার ঘোষণা এবং এই সঙ্গে নিজের বৃহৎ নিবাস জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। কলকাতায় ফিরে এলে এক বিশাল সম্বর্ধনা সভায় সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জনকে ‘দেশবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১৮] তারপর সারা বাংলায় অসহযোগ দুর্বার গতি লাভ করে।

এর কিছুদিন পরেই বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে পূর্ব ঘোষিত সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল অসহযোগের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গেলে প্রতিনিধি ও শ্রোতাদের হয়ে সম্মেলন ছেড়ে চলে যান। যাওয়ার সময়ে বলে যান, তিনি লজিকের দ্বারা স্বরাজ চান, কিন্তু গান্ধি ম্যাজিক দিয়ে স্বরাজের কথা বলেছেন।[১৯] এবারে অসহযোগ প্রস্তাব

নিয়ে গান্ধি-পাল বিতর্ক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু বক্তব্য রাখা প্রয়োজন। বিপিনচন্দ্র দাবি করেছিলেন গান্ধিকে স্বরাজের সঙ্গে গণতান্ত্রিক কথাটি জুড়তে হবে, যা গান্ধি মেনে নেননি। গান্ধি বলেছিলেন গণতান্ত্রিক না হলে তো স্বরাজ কথাটি অর্থবহ হয় না। তার আগেও তিনি ইটালির প্রসঙ্গে বলেছিলেন, গ্যারিবল্ডি কাবুর সকলেই ইটালিয়দের শাসন চেয়েছেন; কিন্তু একমাত্র ম্যাজিনিই বলেন, ইটালিয় জনগণের দ্বারা জনগণের ইচ্ছায় পরিচালিত শাসনই তাঁকে আকর্ষণ করে। গান্ধি স্বরাজের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন নি, এই অভিযোগে গান্ধি বলেছেন, এককভাবে তিনি স্বরাজের বিস্তৃতনীতি নির্ধারণ করতে পারেন না। জনপ্রতিনিধি সকলে মিলেই স্বরাজের পূর্ণ ব্যাখ্যা করবেন।[২০] তবে গান্ধি পরবর্তীকালে স্বরাজ সম্পর্কে বিশদ ভাবে, অসাধারণ ভাবেই স্বরাজের ব্যাখ্যা করেছেন। কাউন্সিল প্রবেশ প্রশ্নে চিত্তরঞ্জন প্রথমে বিপিনপালের পক্ষে, তারপর অসহযোগী হয়ে বিপক্ষে এবং অসহযোগ স্থগিত হওয়ার পর তিনি কারাবাস থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, গান্ধি কারাগারে থাকায় কোন আন্দোলনই হচ্ছে না এবং মডারেটরা কাউন্সিল ভর্তি করে জনপ্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তাই মন্টফোর্ড সংস্কার ভাঙার জন্য কাউন্সিলে প্রবেশ প্রয়োজন। এই প্রশ্নে কংগ্রেস বিভক্ত হয়। দাশ অনুগামীরা প্রো-চেঞ্জার হিসেবে ‘স্বরাজ্য দল’ গঠন করেন। ২৪ সালে গান্ধি কারাবাস থেকে বেরিয়ে কার্যত স্বরাজ্য দলকে তো মেনে নিলেন। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, বিপিনচন্দ্রের সংশোধনীতে ভুল কোথায়? তবে একটা কথা গান্ধি তখন বলেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের দোষীদের না হলে কাউন্সিলে প্রবেশ করা যায় না। এরমধ্যে অবশ্য জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘাতক ডায়ারের শাস্তি হয়েছে। তাঁকে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা হবে না-এই মর্মে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী চার্চিল কমন্স সভায় বিবৃতি দিয়েছেন। তবে ২৪ সালে গান্ধি যদি স্বরাজ্য দলকে মানতে পারেন, যদিও নীতিগত ভাবে নয়, তা হলে শর্তসাপেক্ষ বিপিনচন্দ্রের প্রস্তাবের কথা বিবেচনা করতে পারতেন। বিদ্যালয় বর্জন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের কথায় সারবত্তা রয়েছে। কিন্তু সরকারি বিদ্যালয় না ছাড়লে ছাত্র শিক্ষক আসবে কোথা থেকে? আদালত বর্জন ও সালিশি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। খিলাফত প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু একথা সহজবোধ্য যে, অসহযোগ এত ব্যাপক হত না, যদি না খিলাফতিরা ব্যাপকভাবে তাতে অংশ নিতেন। এক শ্রীহট্ট জেলার তালিকা দেখলেই তা দেখা যায়। প্রশ্নটা গভীরতর, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মেলবন্ধনের। প্যান ইসলামিজমের প্রভাবে কিছু খিলাফতি কংগ্রেস ছেড়েছেন। আবার একথাও সত্য যে খিলাফত-বিরোধী অনেক মুসলমান নেতা, যার পুরোভাগে জিন্না ছিলেন, তাঁরাই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেছেন। অন্যদিকে অগণিত খিলাফতি ধর্মীয় সম্প্রীতিই বরাবর চেয়েছেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক গভীরে প্রোথিত হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনেকেই দেশভাগের বিরোধী ছিলেন, যদিও তাদের বড় অংশ গোড়ামির উর্ধ্বে নন। তবে ধর্মের বিষয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের মেলবন্ধন সমর্থন করা যায় না। গান্ধির একদা সচিব বুদ্ধিধর্মী নির্মলকুমার বসুর একটি উক্তি উল্লেখ করছি। যখন নবকর্মের উন্মাদনায় মত্ত, চিন্তা

ও বুদ্ধিকে যখন ব্যাঘাত সৃজনকারী বলিয়া মনে করা হইতেছে, স্বেচ্ছায় বৃত মহাত্মা গান্ধিকে নির্বিচারে অনুসরণ করাই দেশ জোড়া সৈনিক সম্প্রদায়ের ধর্ম বলিয়া আমরা মনে করিয়াছি। এ অবস্থায় বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা চিন্তামণি প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কর্ম কোলাহল চিন্তা ও বুদ্ধিকে স্পর্শ করিল না। খেলাফত সমস্যা তুর্কী জাগরণে নিশ্চুপ হইয়া গেল। কিন্তু সেই আন্দোলনের আওতায় মুসলিম সমাজের যে স্বকীয়তা স্বাজাত্য বোধের পরিপন্থী হইয়া দেখা দিল তাহাই উত্তরকালে খণ্ডিত করিয়া আমাদের সমূহ ক্ষতি সাধন ও স্থায়ী সমস্যার মধ্যে পরিণতি লাভ করিল।’[২১] নির্মলবসুর বক্তব্য প্রণিধান করেও দেশভাগের সঙ্গে তা মেলাতে পারছি না। শ্রীহট্টের গণভোটে বিরাট অংশ মুসলমান ভারতের পক্ষে কাজ করেছেন। দেশভাগের অগ্রণী ছিলেন সেই মুসলমান নেতারা, যাঁরা মুসলমানের মতো জীবনচর্চা ও চর্যা না করে রাজনৈতিক কারণে বা ব্যক্তিগত মোহে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা হন। একদা খিলাফতের নেতা মৌলানা আজাদ দেশভাগের প্রাক্কালে বলেছিলেন, তিনি অবিচ্ছেদ্য ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ। তাঁর ভাবনাটা তিনি ছাড়া ভারতের মহান আদর্শের সৌধ পূর্ণ হবে না। ‘আমি কখনো অবিচ্ছেদ্যতার দাবি ছাড়বোনা’। দেশভাগের বিষয়ে এখানে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। প্যান ইসলামইজমের সঙ্গে নির্মলবাবু যদি কংগ্রেস নেতাদের আশু ক্ষমতাসীন হওয়ার লিপ্সা, কম্যুনিস্টদের সহযোগে মুসলিম লিগের পাকিস্তান আন্দোলনকে আর্থিক বৈষম্যের ওপর করে দরিদ্রতর মুসলিম জনগণের সমর্থন আদায় এবং অবশ্যই তার সঙ্গে গভীরে প্রোথিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার কথা উল্লেখ করতেন, তা হলে ভালো হত।

গান্ধির সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের অসহযোগ প্রশ্নে মতভেদ ছিল। গান্ধির মতে পাঞ্জাব সমস্যা সমাধান ও হিন্দু মুসলমান সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা স্বরাজের চেয়ে জরুরি। বিপিনচন্দ্র মনে করেছিলেন স্বরাজই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অন্য সমস্যা সমাধান স্বরাজ পরবর্তীকালে কঠিন হবে না। গান্ধি আরও পরবর্তীকালে স্পষ্টতরভাবে বলেছিলেন, স্বশাসনই আমাদের লক্ষ্য নয়, তা ভাল শাসনের একটি উপায়।

জনগণের সামগ্রিক কল্যাণই প্রকৃত গণতন্ত্রের লক্ষ্য। যে কোন ব্যবস্থাই ভেঙে পড়তে পারে যদি জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকে। ২৪ সালে তিনি বলেন, আমি নিছক ইংরেজের জোয়াল থেকে মুক্ত হতে চাই না, আমি চাই সব জোয়াল থেকে মুক্তি। রাজা লকের সঙ্গে স্টকের বিনিময় চাই এরপর থেকে বিপিনচন্দ্রের জনপ্রিয়তার হতে থাকে। তাঁর লেখা যা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ আগ্রহভরে প্রকাশ করত, তারাও তাঁকে বর্জন করে। তখন বিলিতি মালিকানার ইংলিশম্যান, স্টেটসম্যান প্রভৃতি কাগজে লিখতেন। ও উমা মুখার্জি, এমনকি প্রবাদপ্রতিম বিনয়কুমার সরকারও মনে করেন, এরপর জাতীয় আন্দোলনে বিপিনচন্দ্রের আর কোনো ভূমিকা থাকেনি।[২৩] তিলক তখন লোকান্তরিত, লাজপত রায়ও তাঁর সঙ্গে নেই, আরও অনেক অনুগামী ও অনুরাগীও তাই। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, জাতীয় আন্দোলন থেকে তিনি এর পরেও

বিচ্ছিন্ন হননি। তৎকালীন পরিস্থিতিতে চৌরীচুরার ঘটনা, তারপর গান্ধি কারান্তরালে, স্বরাজ পার্টি গঠন, কাউন্সিলে প্রবেশ সবই ঘটে গিয়েছে। সেই প্রেক্ষায় কারামুক্ত গান্ধির প্রয়াসে মহম্মদ আলির আহ্বানে বেলগাঁওতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধির প্রস্তাবক্রমে প্রবহমান পরিস্থিতিতে কার্যসূচি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটিতে অন্যান্য বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালও ছিলেন। গান্ধি তাঁর বক্তব্যে বলেন, অনেক দিন পর আমরা বিভিন্ন মতাবলম্বীরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিটির আলোচনার সিদ্ধান্ত চিত্তরঞ্জন, মতিলাল ও গান্ধির নামে প্রচারিত হয়। গান্ধি এই সম্মেলনে দৃঢ়ভাবে বলেন, সরকার চিত্তরঞ্জনের মাথা নিতে (আঘাত) পারেন, কিন্তু বাংলাকে কিছুতেই দাবানো যাবে না। কারণ স্বরাজের প্রশ্নে আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ। এই সময় পাঞ্জাবের নেতা ডা: সৈফুদ্দিন কিচলু গান্ধিকে এক তারবার্তায় বলেন, ঐক্যের জন্যই যেন ঐক্য না করা হয়। স্বরাজের জন্যই ঐক্য যেন করা হয়, যেন নীতি বিসর্জন না করা হয়। গান্ধি তাঁকে জানান, অন্যদের প্রত্যয় উৎপাদন করতে কিংবা তাঁদের মতের সঙ্গে আমাদের সহমত হওয়ার জন্য আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন।[২৪]

বিপিনচন্দ্র ও গান্ধির মনন সম্পর্কে আলোচনার আগে তাঁদের যোগাযোগের আরও দুটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে বিধ্বংসী বন্যা হয়, এতৎ অঞ্চলে মানুষ যা ছত্রিশ বাংলার বন্যা বলে উল্লেখ করেন। তা জেনে গান্ধি অনুসারী ঠক্কর বাবা কয়েক হাজার টাকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু তা নিতান্তই অপ্রতুল। এরমধ্যে বিপিনপালকে সম্পাদক করে শ্রীহট্ট-কাছাড় বন্যাত্রাণ কমিটি গড়ে উঠেছে। বিপিনচন্দ্রের অনুরোধে গান্ধি তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে সাহায্যের জন্য আবেদন জানান।[২৫] বিপিনচন্দ্রের প্রয়াণের পর গান্ধির কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা পাইনি। তখন গান্ধি একোড়া জেলে তপশীল সমাজকে হিন্দু থেকে আলাদা করার বিরুদ্ধে অনশনরত। ১৯৩৬ সালে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ভাবনাগত সাযুজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ পাই। ৩রা মার্চ গান্ধি সেবাসঙ্ঘের এক সভায় গঠনমূলক কাজের গুরুত্ব বোঝাতে একটি পুরোনো ঘটনার উল্লেখ করেন। 'একবার তেজবাহাদুর সাপ্রু, সি.আই. চিন্তামণি ও বিপিনচন্দ্র পাল সেখানে উপস্থিত। চিন্তামণি রচনাত্মক কাজ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখেন। পাল, যিনি আমার প্রদিদ্বন্দ্বী বলে পরিচিত ছিলেন অবশ্যই ঘটনাটি অসহযোগের কিছু পরবর্তী সময়ের, তার জবাবে এই কাজের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। ভাষা ব্যবহারে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন। তিনি সমগ্র বিষয়টি যে ভাবে বললেন, তা আমি যে ভাবে বলতাম তার চেয়ে অনেক উন্নতমানের, এতে দেশের মর্যাদা বেড়ে যায়। আমরা যা ফেলে এসেছি, তা এখন থাকলে আমাদের শক্তি দিত। যা আমরা অন্য লেখায় বা সাময়িক পত্রে পাব না। যা তিনি তাঁর অনবদ্য ভাষাগত সৌকর্যে বললেন, তা আমি হয়ত অস্পষ্ট মামুলি ভাষায় বলতাম।'[২৬] বিপিনচন্দ্র গান্ধির মতো হয়ত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি। তবে তিনি যে একাজের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন তা প্রতীয়মান হয়।

গান্ধি ও বিপিনচন্দ্রের মনন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রথমে তাঁদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার উন্মেষ, বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারি। বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্টের পৈল গ্রামে যে পরিবারে জন্মেছেন তা মোটামুটি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন, কিন্তু প্রথাগত সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ। তবে ব্যাপক অর্থে পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যোৎসাহিতা পরিবারের ঐতিহ্য ছিল। কলকাতার সিলেটি মেসে থেকে সত্যনিষ্ঠা নিয়মনিষ্ঠা, গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে প্রত্যক্ষপরিচয় এক ব্রাহ্মণ সহাধ্যায়ী ব্যক্তিগতভাবে জাতপাত না মানলেও অন্যতর জাতের বন্ধুদের সব রান্না খেলেও ভাত খেতেন না। কারণ বাড়িতে যদি কেউ জানতে চায় অন্য জাতের রান্না ভাত খেয়েছেন কিনা, তাহলে মিথ্যা বলতে হবে না। তরকারি নিয়ে তো কেউ জিজ্ঞেস করেনা।[২৭] অরবিন্দের বিরুদ্ধে বোমা মামলায় ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকার কিছু লেখা নিয়ে আদালত থেকে সমন জারি করে। বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল না। তিনি নিজে বোমার রাজনীতির বিরুদ্ধেও ছিলেন। কিন্তু আদালতে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে তিনি রাজি হলেন না, পাছে তাঁকে মিথ্যা বলতে হয়। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর দুমাসের কারাবাস হল। আদালতে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ও চম্পারণ মামলায় গান্ধি দ্ব্যর্থহীন ভাবে বিচারককে বলেছিলেন, ‘আপনার আইনে আমি অপরাধী হলে আপনি আমাকে যে কোনো শাস্তি দিতে পারেন। আমি তা মেনে নেব। কিন্তু তার জন্য আপনার কথা মত দুঃখ প্রকাশও করব না, ভবিষ্যতে তা মানব সে রকম প্রতিশ্রুতিও দেব না। কারণ আপনার আইনের ভিত্তি দুর্বল। ঈশ্বরের আইনে আমি অপরাধী নই।’ গান্ধির সত্যনিষ্ঠার দলিল তো আত্মজীবনী, যা সত্যের পরীক্ষা বলে বিশ্বজোড়া সুপরিজ্ঞাত। গান্ধি তাতে কিশোর বয়স থেকে তাঁর সমস্ত অন্যায় কাজ লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধা করেন নি।[২৮]

ধর্মীয় ভাবনার দিক থেকে বিপিনচন্দ্র কলকাতায় এসে রাজা রামমোহনের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পড়েন। ক্রমশ তিনি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মদের মধ্যেও কিছু কুসংস্কার, ব্যক্তিবিশেষের কর্তৃত্বাভিমান মেনে নিতে পারেন নি। আদি সমাজ থেকে নববিধান এবং তা থেকে সাধারণ সমাজ পরিক্রমার মধ্যে অনেক কিছুই তাঁর ভাল লাগেনি। শিবনাথ শাস্ত্রী, এমনকি কেশবসেনের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ হয়। ব্রাহ্ম সমাজে অবস্থানের সময় থেকেই তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সান্নিধ্যে আসেন। বিজয়কৃষ্ণ অদ্বৈত বংশজাত এবং পারিবারিক সূত্রে গুরু হয়ে পড়েন। তিনি শিষ্যদের ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে সব মানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা বলতেন, তাদের সমতার কথা বলতেন। তখন এক বালক তাঁর উপবীত ধারণের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাঁর মনে পাপ বোধ সঞ্চারিত হয়।[২৯ক] তিনি এসব সংস্কারের ঊর্ধে ব্রাহ্ম মতে আকৃষ্ট হন। সমাজের ভূমিকা পালনে তিনি বেদ উপনিষদের ব্যাখ্যা দিতেন। একবার লাহোরে ধর্মপ্রচারে এসে তিনি এক খারাপ স্বপ্ন দেখে জীবননাশের সঙ্কল্প নিয়ে রাবি নদীর তীরে আসেন। সেই সময়ে আকস্মিকভাবে এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি কেন আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিজয়কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে সেই ভদ্রলোক তাঁকে বলেন, মসজিদে নামাজ

আদায় করার সময় তিনি অলৌকিক আদেশ পেয়েছেন যে, তাঁকে আত্মহত্যারত ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করতে হবে। এ থেকে বিজয়কৃষ্ণের নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা পথ-পরিক্রমা আরম্ভ হল। আবার তিনি বৈষ্ণব আদর্শের অনুসারী হলেন এবং সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়ে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান মহিলার এঁটো পেয়ারা খেতেও দ্বিধা করলেন না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অগণিত যুবককে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব অপরিসীম।[২৯খ] তুলনীয় না হলেও বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবও নগণ্য নয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন সতীশ মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বিপিনচন্দ্র পাল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলেন সতীশচন্দ্র ও তাঁর সহযোগী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিপিনচন্দ্রের মতো অশ্বিনীকুমারেরও গৌরবজনক ভূমিকা ছিল। বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্র-শিষ্য বিপিনচন্দ্র পরাভূত হবেন জেনে আপোস করতে চাননি কি ধর্মের ক্ষেত্রে, কি রাজনীতি কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে। রাজনীতিতে তিলক তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তিলকের ধর্মীয় আচার পালন তাঁর কাছে গোঁড়ামি মনে হত। হিন্দু বিবাহের Consent Bill নিয়ে তাঁর বিরোধিতার কারণ হিসেবে তিলক বলতেন, হিন্দু সমাজের নিজস্ব ব্যাপার। বিদেশী শাসক তাতে নাক গলাবে কেন? বিপিনচন্দ্র এই খসড়া বিধেয়কের সমর্থক ছিলেন এবং মনে করতেন, তিলকের উগ্র স্বাজাত্যভাব ধর্মীয় গোঁড়ামি মিশ্রিত।[৩০]

বৈষ্ণব ভাবাদর্শের ব্যাখ্যাকার সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার কথা তথ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের রাধাকৃষ্ণ যে আলাদা তা ব্যাখ্যা করে তিনি রাধাকৃষ্ণে ভেদভাবকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' রাধাকৃষ্ণের লীলা হচ্ছে নিত্যলীলা। যদিও এই পদদুটি তিনি নিজে ব্যবহার করেননি, কিন্তু তাঁর অনন্য ব্যাখ্যা থেকে এই প্রত্যয় দুটির কথা স্বত-ই মনে আসে। 'নারায়ণ' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন, 'কৃষ্ণ তত্ত্বকে বুঝতে গেলে অনেক শাস্ত্র পড়া প্রয়োজন, কিন্তু আমি আমার গুরুদেবের কৃপায় তিলে তিলে তা উপলব্ধি করেছি।'[৩১] জীবন সায়াহ্নে তাঁর উপলব্ধি হচ্ছে: 'যখন আত্মস্থ হইয়া নিজের দিকে তাকাই তখন তো' এ জীবনের উপর প্রকারে নিজের কর্তৃত্বাভিমানের কিছু পরিমাণ অবসর খুঁজিয়া পাই না. . . ইহা অস্বীকার করিতে যে এ জীবনের কর্তা আমি নিজে নহি।' এই প্রেক্ষায় বৈষ্ণব বিপিনচন্দ্রের কর্মজীবনে অনাসক্তির কথা ভাবতে হয়।[৩২]

মোহনদাস গান্ধি বৈষ্ণব পরিবারে জন্মেছেন। পরিবারে সর্বধর্মের একটি বাতাবরণ ছিল। তাঁর পিতার কাছে নানাধর্মের মানুষ এসে আলোচনা করতেন। তবে জাতপাত প্রভৃতি কুসংস্কার বহাল থাকায় কিশোর বয়সেই তিনি পীড়িত বোধ করতেন। পারিবারিকভাবে তিনি ছিলেন বল্লভীয় ধারার বৈষ্ণব। কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় আন্দোলনের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তিনি জগতে সর্বত্র ঈশ্বরের লীলা দেখতেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব তাঁর ভাবনায় এসেছে বলে মনে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সকল ধর্মের

সাধনা দ্বারা তিনি সর্বধর্মে সমভাব প্রচার করেননি। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি-সঞ্জাত সহজাত বুদ্ধি দিয়ে তিনি তা উপলব্ধি করতেন। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের সারসত্য সন্ধান করতে গিয়ে তাদের মধ্যে যে মতান্ধতা ও কুসংস্কার রয়েছে, তিনি তার বিরোধিতা করেছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা এবং বিশ্বশিক্ষকের দ্বৈতভূমিকা পালনের মধ্যেও তাঁর অনাসক্তি দেখে দার্শনিক জোয়াড বিস্মিত হয়েছিলেন। এবং তাঁকে অসাধারণ নৈতিক প্রতিভা বলে উল্লেখ করেন।[৩৩] বিপিনচন্দ্রের মতো গান্ধিও স্বীকার করেছেন, তিনি সব সময়ে আদর্শ অনুসরণে সফল হননি। গান্ধিকে যদি আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে না মনে করে একজন বড়ো মাপের মানুষ হিসেবে দেখি, তাহলে তাঁর বিচ্যুতি যদি কখনো চোখে পড়ে, তাতে তাঁর মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না। অনেক বিষয়ে সহমত না হয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘মহাত্মা’ ও সুভাষচন্দ্র তাঁকে ‘জাতির পিতা’ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

পাল ও গান্ধির মনন সম্পর্কে মনে হয়, স্বদেশী ও স্বরাজ দুটি প্রত্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে বিশদ আলোচনার সুযোগ কম। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে বিপিনচন্দ্রের ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। তারপর ১৯০৬ সালে দাদাভাই স্বরাজকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। হোমরুললিগের মাধ্যমে অ্যানি স্বরাজের ভাবনা জনপ্রিয় করেন। তিলকের ‘স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার’ তরুণ মানসে অতুলনীয় মাদকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে বয়কট, স্বদেশী, স্বরাজ এই ভাবনাকে শিলচর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে বলিষ্ঠতায় ও অনন্য বাচনভঙ্গিতে বিপিনচন্দ্র পৌঁছে দিয়েছেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। সেই সময়ে (১৯০৬-০৮) স্বরাজকে তিনি সর্বাঙ্গীণ সার্বভৌম জাতি সত্তার প্রকাশ রূপে ব্যাখ্যা করতেন। স্বরাজ শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, তা আর্থনীতিক ও সামাজিক। তাঁর ভিত্তি বেদান্তের ধর্মতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে স্বাধীনতাকে জীবনের সর্বস্তরে প্রসারিত করা। অর্থাৎ সব মানুষের আত্মার মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই আমাদের মুক্তাবস্থা নিত্য। কিন্তু অজ্ঞানতাবশত আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না। স্বাধীনতা হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্বনির্ধারিত ব্যবস্থার মান্যতা।[৩৪ক] অন্যত্র তিনি বলেছেন, এই স্বরাজকে বুঝতে গেলে পররাজের সঙ্গে তার তফাৎ বুঝতে হবে। ‘যদি সরকার এসে বলে এই নাও স্বরাজ, তাহলে আমি বলব ধন্যবাদ। আমার নিজের হাতে তা অর্জন করতে না পারলে আমি তা গ্রহণ করতে পারি।[৩৪খ] সু-রাজ বদান্য স্বৈরতন্ত্র থেকেও আসতে পারে, যা অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্র থেকেও খারাপ। প্রথমটির ক্ষেত্রে আমাদের তা মেনে নেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমরা সক্রিয় বিরোধিতায় প্রণোদিত হই। তারপর ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে স্বশাসন যে অবাস্তব এবং অগ্রহণযোগ্য তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। সেই পর্বের বিপিনপালের মতে ছিটেফোঁটা সুবিধে বা কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার থেকে স্বরাজ আসবে না। বৃহত্তর আঙ্গিকে ‘স্ব’ রচনার কথা তিনি বলতেন। তাঁর মতে আমরা Reform চাই, চাই Re-form। বিপিনচন্দ্র যে পরবর্তীকালে তাঁর অভিমতের অনেক পরিবর্তন করেছেন, তা আগে উল্লেখ করা

হয়েছে। তবে প্রথম পর্বেও বিশ্বজনীনতা ও বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শের কথা অনেক সময়ে বলেছেন।[৩৪গ]

গান্ধি সম্ভবত আরও গভীর অর্থে স্বরাজ্রের ভাবনা করেছেন। তিনি বলতেন, ইংরেজ চলে গেলে আমরা স্বাধীন হব, কিন্তু তাতে কি স্বরাজ আসবে? গান্ধির মতে, যদি আমরা স্বরাজ চাই, তাহলে কী করে আমাদের শাসন করব তা জানতে হবে। উপনিষদীয় ভাবধারায় তিনি বলেন, একমাত্র স্বরাট ব্যক্তিরাই যথার্থ স্বরাজ অর্জন করতে পারে। গান্ধিভাবনা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ যদি স্বরাট বা স্বয়ং দীপ্যমান হয়ে যায়, তবে প্রত্যেকে যে স্বরাজ অর্জন করবে তাতে কোনো শাসনেরই প্রয়োজন থাকবে না। যেহেতু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। যদিও বিপিনচন্দ্রের মতোই তিনি মনে করতেন, ব্রহ্মাণের প্রকাশ আত্মনের মধ্যে হয়। সেই আত্মাও স্বরূপত ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তাই আত্মবিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে জাতিকে স্বরাজ অর্জনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।[৩৫] তিনি বাস্তব প্রেক্ষায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গ্রাম স্বরাজের ভাবনা নিয়ে আসেন। যাতে স্বশাসন সকল মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে। গান্ধি স্বরাজকে একটি বর্গক্ষেত্রের সদৃশ রূপে বর্ণনা করে বলেন, এর চারটি রেখা এরকম হবে : রাজনৈতিক, তার বিপরীত রেখা আর্থনীতিক। তৃতীয়টি সামাজিক, তার বিপরীত চতুর্থ রেখাটি হবে নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক। তার যে কোনো একটি অবহেলিত হলে যথার্থ স্বরাজ আসতে পারে না। তা অর্জন করার পথ তাঁর মতে ছিল স্বদেশী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা তথা জাতপাত বর্জন এবং পদ্ধতি হবে সত্য ও অসিংসা।[৩৬ক] গ্রামের স্তর পর্যন্ত ক্ষমতা পিরামিডের মতো ওপর থেকে নীচে নামবে না। সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো তা ক্ষুদ্রগণ্ডী থেকে বৃত্তাকারে বিশ্বের সব মানুষের স্বরাজ পর্যন্ত প্রসারিত হবে।[৩৬খ]

গান্ধির স্বরাজের ধারণার সঙ্গে স্বদেশী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। অর্থনীতির দিক থেকে গান্ধি স্বদেশী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর মতে স্বদেশী আমাদের ধর্ম ও অর্থ রক্ষা করে, আবার স্বদেশী তাঁর কাছে অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি এর মধ্যদিয়ে জাতীয় আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। স্বদেশী প্রসঙ্গে গান্ধির ভাবনা হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষই একটি জনসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে পরিপোষণ করে তার একটি জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে ওঠে। তার সঙ্গে তার প্রাকৃতিক, সামাজিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি জড়িয়ে থাকে। এই সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, অবশ্যই ঐতিহ্য অনুরাগী হয়ে। তার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা থাকলে তা পরিহার করতে হবে। পৃথিবীর কোনো প্রান্তের মানুষের প্রতি তার বৈরী ভাব নেই। কিন্তু ভারতীয় ভূখণ্ডে জন্মানোর জন্য ভারতের প্রতি তার বিশেষ দায়বদ্ধতা তাই ভোগ্য পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্ভব ক্ষেত্রে প্রথমে নিজের গ্রামের, ক্রমান্বয়ে জেলা প্রদেশ ও দেশের জিনিস ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ দূরের চেয়ে কাছের সেবা ও তাকে কাজে লাগানোর নামই স্বদেশী।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিদেশী পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তাতে যে

কুটীর শিল্প উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয় এবং বিদেশী বস্তু পোড়ানোও হয়। কুটীর শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বিপিনচন্দ্রের মতে, পরিপূর্ণ স্বদেশী বা বিদেশী বয়কট কোনো পরাধীন জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণের পথেই স্বদেশীকে প্রসারিত করতে হবে। কারণ স্বদেশীর লক্ষ্য আর্থনীতিক স্বাবলম্বন ও কর্মসংস্থান। গান্ধিও অসহযোগ আন্দোলনে বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোকে সমর্থন করেন। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও এন্ড্রুজের সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বড়োদাদা, যাঁকে গান্ধিও বড়োদাদা বলতেন, তাঁকে পরিপূর্ণ সমর্থন করেন।[৩৮] গান্ধি সব বিদেশী জিনিস বয়কটের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু দেশকে অন্ন বস্ত্রে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজনে তাঁকে এই পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল। তিনি এই প্রসঙ্গে সারা দেশের বয়ন-শিল্পীদের দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, এদেরকে বাঁচানো একান্ত আবশ্যক। শুধু স্বদেশী খাদ্য খেলে বা স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করে কেউ যদি যারা তা উৎপাদন করে তাদের সম্পর্কে সমব্যথী না হন, তবে তা হবে প্রতারণাকর। তাই গান্ধির মতে স্বদেশী একাধারে বহিষ্কারক, অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিকারক।[৩৯]

বিপিনচন্দ্র ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী বলে পরিগণিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর চরমপন্থায় হিংসার কোনো স্থান ছিল না। গান্ধির মতোই তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সমর্থন করতেন না। এমন কি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনও তাঁর কাছে আদৃত ছিল না। এ ব্যাপারে তিলক, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ অনেক সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ছিল। বিপিনচন্দ্র কিন্তু স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির জন্য দেশকে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান করার কথা বলেছেন। গান্ধি তারও সমর্থক ছিলেন না। তাঁর মতে সামরিক শক্তিকে প্রাধান্য দিলে তাতে উগ্র জাতিসত্তার বিকাশ ঘটতে পারে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় চৌরীচুরায় পুলিশ হত্যা ও থানা পোড়ানোর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তিনি আন্দোলন বন্ধ করে দেন। কিন্তু চম্পারণে নিরস্ত্র গ্রামবাসীরা যখন নীলকরদের লেঠেল ও পুলিশের লুঠ ও মহিলা-নির্যাতনের প্রতিবাদ করেনি, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন, তোমাদের হাতে কি লাঠিও ছিল না? পরে অবশ্য তিনি কাপুরুষতার সঙ্গে অহিংস আন্দোলনের তফাৎ বুঝিয়ে তাদের আন্দোলনে শামিল করেন। সেখানেও এবং ৪২ সালে নারী নির্যাতনের প্রতিরোধে তমলুকের আগস্ট বিপ্লবীদের অস্ত্র ধারণকে তিনি নিন্দা করেন নি।[৩৯]

চরমপন্থা বলতে বিপিনচন্দ্র বুঝতেন সক্রিয় আন্দোলনই তবে তা হবে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। স্মরণযোগ্য যে, গান্ধিও সমকালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। টলস্টয় গান্ধির আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি ‘নিষ্ক্রিয়’ পদটিতে আপত্তি জানান।[৪০] পরবর্তীকালে গান্ধি সত্যাগ্রহ নাম দিয়ে আন্দোলনের গতিকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যান।

গান্ধি ও বিপিনচন্দ্রের মনন সম্পর্কিত আলোচনায় এবং জীবনচর্যায় তাঁদের দুজনের মধ্যে সাদৃশ্যটা আমাদের বিবেচনায় সারসত্যমূলক, পার্থক্যটা আনুষঙ্গিক বলে প্রতীয়মান

হয়। এরিস্টটলীয় পরিভাষায় পার্থক্যটা accidens এর সাদৃশ্যটা essence এর। বিপিনচন্দ্রের শতবর্ষে অতুলচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রকাশিত Studies in Bengal Renaissance নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে অন্যান্য রেনেসাঁ পুরুষের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়েছেন। স্বদেশী যুগ নিয়েও অনেক লেখা বেরিয়েছিল। ব্যক্তিগত ভাবেও কিছু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সার্ধ শতবর্ষে করিমগঞ্জ ছাড়া অন্যত্র কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এই নিবন্ধকারের অজানা, বর্তমান বছরটি গান্ধির শহিদত্বের ষাটবছর। তা স্মরণ করে ফ্রান্স থেকে 'গান্ধি-২০০৮' নামে একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে -- যা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ছাড়িয়ে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকায়ও প্রসারিত। এ বছরের ২৯-৩১ জানুয়ারি ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষায় গান্ধির প্রাসঙ্গিকতা প্রতিপন্ন করতে প্রায় ১২৫-৩০জন বিদেশী প্রতিনিধিদের যে আগ্রহ দেখেছি, তা অভিভূত হওয়ার মতো।

বর্তমান ভারতীয় প্রেক্ষায় বিপিনপাল ও গান্ধির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনায় প্রথমেই মনে আসে প্রবহমান রাজনীতিতে নীতিহীনতার কথা Politics হয়ে পড়েছে Polytricks। গণতন্ত্রে তন্ত্র আছে, গণ নেই। এখন ধর্মবিশ্বাসী, নাস্তিক সকলেই ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা করেন। এঁরা দুজনে ধর্ম বিশ্বাসী হয়ে কোনো গোঁড়ামি বা অন্য ধর্মে অসহিষ্ণু ছিলেন না। বৃহদংশের অপরিসীম দারিদ্র্য ও ভীতিপ্রদ কর্মহীনতার পাশাপাশি যখন ক্ষুদ্র সংখ্যার ঐশ্বর্যের ঝলকানি দেখি, তখন তার সূচনার কথাও ভাবতে হয়। ৩০সালে Constructive Programme-এ গান্ধি বলেছিলেন, স্বাধীন ভারতে তৎকালীন প্রবহমান আর্থিক বৈষম্য চলতে পারে না। তা চলতে দিলে পরিণতি রক্তাক্ত বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। স্বাধীনতার কিছুদিন পরে (৩১-১২-১৯৪৭) তাঁর তথাকথিত অনুগামীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে গান্ধি লিখেছিলেন, 'আমরা অভ্যস্ত ছিলাম ভাবতে যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করা খুব কঠিন। এখন দেখছি তা তুলনামূলক ভাবে অনেক সহজ। ...এখন আমরা নিজেদের মূলেই আঘাত করছি; যখন দায়িত্ব এসে পড়ছে, তখন পালিয়ে যাচ্ছি। শুদ্ধতা ছাড়া ভাল সরকার হয় না। আমরা অস্বচ্ছ বলেই বর্তমান সরকার পেয়েছি। যা হয়েছে তা স্বরাজ নয়। স্বরাজের অর্থ হবে যদি আমরা নিজেদের সরকারের আমলে নিজেরা সরল জীবন যাপন করব এবং অন্যদের সরল জীবন যাপনে প্রণোদিত করব।'[৪১]

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের দাপটে আমাদের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন যিনি উন্নয়নে স্বাধীনতার প্রবক্তা, বলেন, 'স্বদেশী একটি ভাবালুতা nostalgia এবং বর্তমান বিশ্বে সূর্য এম. টি. ভি. ও কোকাকোলার সাম্রাজ্যে অস্ত যায় না।' তাই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে কৃষি জমিতে মোটর গাড়ির কারখানা করতে রাজ্য সরকারও রতনটাটাকে শংসাপত্র দেন। এ থেকে উত্তরণের প্রয়াস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও আরম্ভ হয়েছে -- ভারতেও তার উদ্যোগ চলছে। তাকে সুসংহত করতে আমদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে ভবিষ্যৎ রচনার প্রয়াস চালানো উচিত। কিন্তু প্রেরণা নিয়ে অতীতের দিকে তাকাতে হবে। সে

ক্ষেত্রে অন্যান্য কয়েককানের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল যোহনদাস গান্ধির মন ও মনন অনুধাবন করা প্রয়োজন।

উল্লেখ সূত্রাবলী ঃ

১. Pyarelal, Mahatma Gandhi: Early Phase, Vol. 1, p. 156.
২. S. Sastri, My Master Gokhale, p.58
৩. Ibid
৪. Bipin Chandra Pal, Memories of My Life and Times, pp. 157-58 (সাধারণ ভাবে বিপিনচন্দ্রের ‘সত্তর বৎসর’ ও দ্রষ্টব্য।)
৫. Mahatma Gandhi : A Chronology, p. 32
৬. Ibid., p.57.
৭. Tendulkar, Mahatma Gandhi, Vol. 1, p.14
৮. Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. IX, pp. 451-53.
৯. Ibid., Vol IX, p. 474
১০. Haridas & Uma Mukherjee, Bipin Chandra Pal & Indian's Struggle Swaraj, p. 112
১১. Ibid pp. 108-109
১২. Ibid., p.118
১৩. Ibid., p.119
১৪. করিমগঞ্জ কলেজে অধ্যাপক দিগিন্দ্রনাথ দাসের ক্লাশ বক্তৃতা (১৯৫৬)
১৫. জ্ঞানাঞ্জন পালের সঙ্গে নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত আলোচনায় তাঁর উক্তি।
১৬. CWMG, Vol. XVI, pp. 375-376
১৭. Ibid., Vol. XVIII, pp. 250-51.
১৮. সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র পৃ. ৪২
১৯. Haridas & Uma Mukherjee, Bipin Chandra Pal & Indian's Struggle For Swaraj, p. 121
২০. CWMG. Vol. XVIII, Spl. Congress Speech on Sept. 8,1920, Tendulkar, op.cit., Vol. II, pp. 14-15
২১. নির্মলকুমার বসু, বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক - পৌষ (১৯৫০) (শিবদাস চক্রবর্তী,

বিপিনচন্দ্র পাল: রাজনীতি, ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতি)

২২. Young India, 12.6.1924, pp. 14-15

২৩. Haridas & Uma Mukherjee, op.cit.; also B.K.Sarkar, ibid. (Appendix-II)

২৪. CWMG., Vol. XXII., p. 341

২৫. Ibid., Vol. XXXXI, pp. 286-287

২৬. Ibid., Vol. XXXXXXII, p.228

২৭. বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর

২৮. Haridas & Uma Mukherhee, op.cit, pp. 88-89

২৯. Bipin Chandra Pal (ed. J. Pal), Saint Bijaykrishna Goswami pp.24, 52; B.C.Pal, Bengal Vaishnavism

৩০. শিবদাস চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

৩১. Bipin Chandra Pal, Bengal Vaishavism

৩২. বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, পৃ. ৭-৮

৩৩. C.E.M.Joad (ed. S. Radhakrishnan), The Authority, Detachment and Morale in Mahatma Gandhi, p. 166.

৩৪ক. Bipin Chandra Pal, Swadeshi and Swaraj, pp. 146, 197, 220 and chapter on Gospel of Swaraj.

৩৪খ. Ibid.

৩৪গ. Ibid.

৩৫. CWMG., (দ্র. বিভিন্ন খণ্ডের বিচ্ছিন্ন আলোচনা এবং R. Roy, Self and Society Bhiku Parekh, Political Philosophy of Mahatma Gandhi).

৩৬ক. Harijan, 28.7.1948.

৩৬খ. CWMG, Vol. LXIV., p.191.

৩৭. CWMG, Vol. XVIII, p. 32; গান্ধি রচনাসম্ভার, ৫ম খন্ড, পৃ. ২০০

৩৮. Young India, 6 Oct., 1921

৩৯. J.P. Kripalani, Speech at Punjab University on Gandhiji's Political Thought; তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের বিদ্যুৎ বাহিনীর অধিনায়ক সুশীল ধাড়ার লেখকের কাছে প্রেসিডেন্সি জেলে উক্তি।

৪০. Young India (C.F.Andrews-এর True Satyagraha)

৪১.	CWMG, Vol. LXXXX, p. 331.

সন্দীপ দাস : জন্ম স্বাধীনতা-পূর্ব শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ শহরে ১৯৩৮ সালে। শিক্ষা করিমগঞ্জ শহরের পাবলিক হাইস্কুল, করিমগঞ্জ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬১ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন উলুবেড়িয়া কলেজ এবং বিভিন্ন সময়ে সিটি কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, হাওড়া গার্লস কলেজ ও রানাঘাট কলেজে। অবসর গ্রহণের পর ১৯৯৮ থেকে আজ পর্যন্ত 'ওয়ার্ধা ইনস্টিটিউট অব গান্ধিয়ান স্টাডিজ'-এর পরিদর্শী অধ্যাপক। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের ফেলো ছিলেন। করিমগঞ্জ কলেজে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন 'কাছাড় ছাত্রসমিতি'-র সাধারণ সম্পাদক ও 'ছাত্রসংস্থা'-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অর্গেনাইজেশন'-এর সম্পাদক। জয়প্রকাশ নারায়ণ পরিচালিত বিহার আন্দোলন তথা নবনির্মাণ আন্দোলনের সঙ্গে ছিল নিবিড় সংযোগ। 'সর্বাত্মক বিপ্লব' সপ্তাহিকের সম্পাদনাও করেছেন। কৃষক আন্দোলন, বনবাসী আন্দোলন ও শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। ১৯৬৪ সালে নিরাপত্তা আইনে এবং জরুরি অবস্থায় মিসা-আইনে কারাবন্দি হন। AIFUCTO ও WBCUTA-র কার্যনির্বাহক সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য। বর্তমানে 'জয়প্রকাশ অন্ত্যোদয় নিধি' ও 'গান্ধি-জয়প্রকাশ আকাদেমি'-র অন্যতম পরিচালক। 'গান্ধি শান্তি প্রতিষ্ঠান'-এর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। কলকাতার চৌরঙ্গি থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন সত্তরের দশকে।

সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে: Jayprakash Centenary Volume, শতাব্দীর অন্বেষণ, উন্নয়ন-অনুন্নয়ন প্রভৃতি। Janata (Bombay), সমাজবাদী ভাবনা, জয়শ্রী, Gandhi Marg প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় লিখে থাকেন।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও বিপিনচন্দ্র পাল

মায়া ভট্টাচার্য

দেশবরেণ্য বিপিনচন্দ্র পালের সার্ধশতবর্ষের স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশ ও জাতি তার পবিত্র কর্তব্য পালন করছে। আজকের অবক্ষয়জনিত সময়ের প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক তথা সামাজিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্য গতিতে মূল্যবোধেরও অবনমন ঘটেছে। আজ বিশ্বায়নের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সংস্কৃতির শিকড়-সন্ধানীমাত্রেই চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধের সংকট উপলব্ধি করছেন। এই পরিস্থিতিতে মনীষীদের জীবনদর্শন ও আত্মোৎসর্গের কাহিনি স্মরণ-মননের মাধ্যমে দেশ ও জাতি, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা কেবল জাতীয় কর্তব্যই নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের মহৎ চিন্তাদর্শ রূপায়ণের পক্ষেও বিশেষ জরুরি। কবি বলেছেন, “মহাপুরুষকে স্মরণ করা কেবল যে কর্তব্য তাহা তো নয়, সেটা যে আমাদের লাভ। স্মরণ যদি না করি তবে তো তাঁহাকে হারাইব। যত দীর্ঘকাল আমরা মহাত্মাদিগকে পূজা করিব, ততই তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের দেশের স্থায়ী ঐশ্বর্যরূপে বর্ধিত হইতে থাকিবে।”[১]

বিপিনচন্দ্র পালের জীবনীতে[২] জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ‘বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ’-এর নামটিই উচ্চারিত হয়নি। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঐতিহাসিক জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে এবং বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইতিহাসে বিপিনচন্দ্রের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনেতা, মননশীল প্রাবন্ধিক ও বাগ্মী হিসেবে বিপিনচন্দ্র সুপরিচিত। কিন্তু ‘বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ’ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে এবং পরিষৎ প্রাঙ্গণে তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের যথাযথ মূল্যায়ন আজও হয়নি।

।।২।।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা-পর্বে (১১ই মার্চ, ১৯০৬) সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তায়, বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মনীষীদের দান ও কল্যাণস্পর্শে বাংলার বুকে গড়ে উঠেছিল ‘বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ’, বাংলা ও বাঙালির ঐতিহাসিক সারস্বত মন্দির। পরিষদের প্রাণপুরুষ আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ (পরে শ্রী অরবিন্দ), আব্দুল রসুল, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ এবং আরো মনীষীদের কল্যাণস্পর্শে যে আলোকবর্তিকাটি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আজও তার দীপশিখাটি অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। উক্ত শিক্ষা পরিষৎ তার জন্মলগ্ন থেকে নানা গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে

এসেছে।

পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে নিজস্ব জাতীয়ধারায় স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বিদ্যাপীঠ। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আর এই শিক্ষা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল হিসেবে 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'-এর নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে।

ভারতের সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক পশ্চিমি শিক্ষার মিলন ঘটিয়ে তদানীন্তন পরিষৎ-কর্ণধারেরা যে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তা কোথাও গৃহীত হয়নি। ফলে বর্তমান দেশ ও জাতির কাছে জাতীয়শিক্ষা আন্দোলন আজ এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। আবেগ নয়, দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতেই পারে, স্বদেশভাবনার যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলার মহত্তম স্বদেশপ্রেমীদের সমাবেশ ঘটেছিল পরিষদের জন্মলগ্নে এবং শতাব্দীর যাত্রাক্রমে যে বিচিত্র পথ অতিক্রম করেছে এই শিক্ষাপীঠ, তার সমান্তরাল কোন কাহিনি বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নেই। জাতীয় শিক্ষার অন্যতম রূপকার বিপিনচন্দ্রের সার্ধশতবর্ষ স্মরণ অনুষ্ঠানে তাই বরাক উপত্যকার সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে সদ্য শতবর্ষ অতিক্রান্ত বিস্মৃতপ্রায় এক শিক্ষাপীঠ 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'-এর কথা স্মরণ করতে চাই, যে শিক্ষাপীঠের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং বিপিনচন্দ্র পাল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫) সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ৭ই জুলাই, ১৯০৫ বঙ্গবিভাগের কথা সরকারিভাবে ঘোষিত হলে সমগ্র বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৬ই অক্টোবর বাংলা দু'ভাগ হলে বাঙালির আন্দোলনও তীব্রতর হয়ে ওঠে। দিনটিকে বাঙালি পালন করল শোকদিবস রূপে ঘরে ঘরে অরন্ধনের মধ্য দিয়ে। এই উপলক্ষ্যে কবিগুরু রচিত "বাংলার মাটি বাংলার জল..." ঐকতানের মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে লক্ষ বাঙালি শোক মিছিলে যোগ দিল। উদ্যাপিত হল রাখীবন্ধন। শুরু হল বয়কট আন্দোলন। বিদেশীদ্রব্য, বিদেশী ভাবধারা বয়কটের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা বয়কটের সিদ্ধান্তও গৃহীত হল। ফলে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনে এবং এই স্বদেশী আন্দোলনই ক্রমে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের মাত্রা নিয়ে রাজশক্তিকে ভাবিয়ে তুলল। সরকারি নিষ্ঠুর দমননীতির ফলে দেশজুড়ে শিক্ষিত বাঙালির মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল, তারই অন্যতম ফল শিক্ষাসংস্কার আন্দোলন। দশদিগন্তে সেইসময় ধ্বনিত হচ্ছিল জাতীয় শিক্ষার মন্ত্র। বেদীমূলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দেশনেতাদের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালও এই শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিলেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষানীতি বর্জন এবং পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার। ইতিমধ্যেই লর্ড কার্জন শিক্ষার মান উন্নয়নের নাম করে আসলে শিক্ষা সংকোচনের অভিসন্ধি নিয়ে চালু করেছিলেন

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪)। সরকারি এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে ওঠল তদানীন্তন বেঙ্গলী (১৮৬৮), অমৃতবাজার (১৮৭৮), ডন (১৮৯৭) আরও অন্যান্য পত্রিকাসমূহ।[3] স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক আন্দোলন দূরে সরিয়ে রাখতে একের পর এক ঘোষিত হল কার্লাইল সার্কুলার, লায়ন ও রিজলী সার্কুলার। প্রতিবাদে বাংলার বুকে গড়ে ওঠল অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি (৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৫)। প্রকাশ্য জনসভায় ও ঘরোয়া বৈঠকে ছাত্রদের উদ্দেশে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের উদাত্ত আহ্বান বাংলার মাটিকে সরব করে তুলল। অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির কার্যাবলীতে জাতীয় শিক্ষার আদর্শকে জাতীয় দাবিতে পরিণত করা হল। ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল কলকাতায় ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমি ক্লাবের সভায় সভাপতির অভিভাষণে (২৪শে অক্টোবর, ১৯০৫) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ও সেইসঙ্গে শিক্ষাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার আহ্বান জানালেন। কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র। ছাত্রদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "তোমরা মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা করেছ এবার পরীক্ষা দেবে না। আবার দ্বিধা করছ কেন?... সেদিন গোলদীঘিতে যখন নিজেরা বলেছিলে, 'আমরা গোলামখানা ছাড়বো' তখন কার কথা শুনে বলেছিলে? আজ যদি এই রাজার মাঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে বল 'আমরা এখানে দাঁড়ালাম, ওখানে আর যাব না, যেখানে To let লেখা হয়েছিল, সেখানে আর আমরা যাব না', দৃঢ়ভাবে একথা যদি বলতে পারো, তবে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হবেই হবে।"[4] ইতিমধ্যেই নিউ ইন্ডিয়া (১৯০১) পত্রিকার মাধ্যমে স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবাদের কথা প্রচার করে রাজনৈতিক মহলে তিনি সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। India for Indians মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন সমগ্র দেশবাসীকে। ২৭শে অক্টোবর কলকাতার পটলডাঙ্গায় চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সহস্রাধিক ছাত্রের উপস্থিতিতে হল এক বিরাট জনসভা। সভায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখদের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন অন্যতম বক্তা। সভাপতির অভিভাষণে কবিগুরু ছাত্রদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "... আজ যে গবর্মেন্টের পরোয়ানায় আপনাদের তরুণ হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার কোনো ঠাণ্ডা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাইনা। আমি এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে এক। ....আবশ্যক হইলে দেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন, আপনারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই অপমানকর (সরকারি) পরোয়ানায় আপনারা যে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি। আপনারা যে এ সংকল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই... কর্তৃপক্ষের তাড়নায় ছাত্রগণ বেদনাবোধ করিয়া যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, গবর্মেন্টের চাকরি ও গবর্মেন্টের সম্মানের আশা বিসর্জন দিয়া স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠেকিতেই হইবে। আজকের এই অবমাননা যে নূতন, তাহা নহে; অনেকদিন হইতেই ইহার সূত্র আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের উচ্চশিক্ষার উপর গবর্মেন্টের অনুকূল দৃষ্টি নাই; সুতরাং গবর্মেন্ট যদি এই পরোয়ানা

প্রত্যাহারও করেন, তবুও আমরা তাঁহাদের হাতে শিক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া শান্ত থাকিতে পারিব না।”[৫] পরবর্তী ২রা নভেম্বর ‘ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমি’তে আয়োজিত ‘ডন’ সোসাইটির সদস্য ও ছাত্রদের সভায় কার্লাইল সার্কুলার প্রসঙ্গে কবি বলেন, “... গবর্মেন্ট যদি দুইদিন পরে এই পরওয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি কখনও ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। ছাত্ররা ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহারা সত্য সত্যই গবর্মেন্টের সম্মান এবং চাকুরির মায়া পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন কিনা। যদি তাহারা যথার্থই প্রস্তুত হইয়া থাকেন তবে নেতৃবর্গ নিঃসন্দেহে তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।”[৬]

কার্লাইল সার্কুলার অমান্য করে রাজনৈতিক সভায় যোগ দেবার অপরাধে রংপুর সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হলে প্রতিবাদে ছাত্ররা বিদ্যালয় ত্যাগ করে এবং ৮ই নভেম্বর, ১৯০৫-এ রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ৯ নভেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কলকাতায় ‘ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমি’ ক্লাবের পাশে পান্তির মাঠে বিরাট জনসভায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হল। উক্ত সভায় সভাপতি সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক তাঁর ভাষণে জাতীয় শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে দিলেন। ইংরেজিতে দেওয়া ভাষণের শুরুতেই সুবোধচন্দ্র বলেছিলেন যে, বিজাতীয় শিক্ষাগ্রহণের ফলে তিনি লজ্জিত। কারণ মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে তিনি অক্ষম। ভাষণান্তে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “... I most humbly beg to place at the disposal of the promoters of this cause my humble contribution of a lakh of rupees. I am not, gentlemen, a wealthy man. I can ill-afford the luxury of making such a gift. But the call of the Mother is clear, and we must respond, be we great or small.”[৭]

সুবোধচন্দ্রের এই দানের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিপিনচন্দ্র সমবেত জনতার উপস্থিতিতে তাঁকে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করলেন। ১০ই নভেম্বর ‘ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমি’ ক্লাবে আয়োজিত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তা বিপিনচন্দ্র জাতীয় শিক্ষার জন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পাঁচ লক্ষ টাকা দানের ঘোষণাটি করলেন। পরের দিন অর্থাৎ ১১ই নভেম্বর কলেজ স্কোয়ারে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হল। প্রায় দশ হাজার ছাত্র ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির পদ অলংকৃত করেন ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী। সভায় রংপুর ও মাদারীপুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সপক্ষে আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পালের মত জাতীয় শিক্ষার বলিষ্ঠ সমর্থকেরা। ১২ই নভেম্বর বিপিনচন্ত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ‘ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমি’ ক্লাবের সভায় অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাও ছিলেন

অন্যতম বক্তা। বাংলা সরকারের তদানীন্তন অ্যাসিসটেন্ট ডি.পি.আই. রাসেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত কলেজ হোস্টেল এবং মেসের বাঙালি ছাত্রদের চরিত্র সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করায়, নেতারা সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাও সেই সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। ঐ একই দিনে বিকেল পাঁচটায় 'ডন' সোসাইটিতে ভগিনী নিবেদিতা 'Present Crisis and the Need of a National University" শিরোনামে উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন।[৮] পরবর্তী ১৪ই নভেম্বর আশুতোষ চৌধুরী ছাত্রদের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের ঐতিহাসিক ফতোয়া জারি করলেন। ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠল। ১৬ই নভেম্বর বেলা ৩টেয় 'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসিয়েশন' (৫২/৪ পার্ক স্ট্রিট) ভবনে আশুতোষ চৌধুরী আহূত এবং রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা অধিবেশনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ এবং আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। সভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠনের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হল: "That in the opinion of this conference it is desirable and necessary that a National Council of Education should be at once established to organise a system of education-Literary, Scientific and Technical-on National lines and under National control....."[৯] প্রস্তাবে বলা হল, অবিলম্বে একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্থাপন করা প্রয়োজন, যার উদ্দেশ্য হবে জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং জাতীয় ধারায় সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সঠিক পদক্ষেপ নিতে গঠিত হল বিয়াল্লিশ জন সদস্যবিশিষ্ট এক অস্থায়ী শিক্ষাসমিতি (Provisional Education Committee)। বিপিনচন্দ্র এই সমিতিরও সদস্য নির্বাচিত হলেন। পরবর্তী ১৯০৬-এর ১১ই মার্চ 'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' সভাগৃহে বিশিষ্ট নাগরিক ও জননেতাদের উপস্থিতিতে গৃহীত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত। নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথি ও নেতৃবৃন্দের ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বরোদা থেকে সদ্য-আগত অরবিন্দ ঘোষ। যে বিরানব্বই জন সদস্য নিয়ে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গঠিত হল বিপিনচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯০৬ সালের ১৫ই আগস্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে বাঙালির বহু আকাঙিক্ষত 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ'এর শুভারম্ভ হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে (১৪ই আগস্ট টাউন হলে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে) এই নবজাত প্রতিষ্ঠানকে 'সজীব মঙ্গল' এর আবির্ভাব বলে অভিনন্দিত করে আশীর্বাদ জানালেন। অরবিন্দ ঘোষকে অধ্যক্ষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তত্ত্বাবধায়ক এবং রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতির পদে বরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের (বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ) যাত্রা শুরু হল।

ইতিপূর্বেই ১৯০৬ এর ৬ই আগস্ট বিপিনচন্দ্র প্রকাশ করেছেন চরমপন্থীদের মুখপত্র

বিখ্যাত ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকা। স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারকার্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে অরবিন্দ ঘোষই ছিলেন পত্রিকাটির কর্ণধার। পরবর্তী সময় পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় বিপিনচন্দ্র ‘বন্দেমাতরম’ এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, যদিও জাতীয়স্বার্থে তাঁকে পুনরায় পত্রিকাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয় ১৯০৮ সালে। ১৯০৭ সালের ১৬ই আগস্ট ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকায় শাসক-বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হন ও পরে জামিনে মুক্তি পান। এই মামলায় অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে অসম্মত হলে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বিপিনচন্দ্রের ছ'মাসের কারাদণ্ড হয়। আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন, “এইরূপ মোকদ্দমা উপস্থাপিত করা দেশের অমঙ্গলকর ও জনসাধারণের শান্তির পক্ষে ব্যাঘাতজনক। আমি বিবেকের প্রেরণায় এইরূপ সর্বসাধারণের অনিষ্টকর ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করিতে পারি না।”[১০]

বিপিনচন্দ্রের প্রতি রাজশক্তির এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে ২১শে মার্চ ১৯০৮ যুগান্তর লিখেছিল, “...এই দেড়শত বৎসরের ভারত শাসনে পাশ্চাত্য ইংরেজ জাতি শাসন ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া যেরূপ নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে উহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন। ... বিশাল ভারতে আর কেহই স্বেচ্ছাচারী শাসককে শাসনের ও ব্যবস্থার অসারতা ও অযৌক্তিকতা পূর্বে প্রদর্শন করায় নাই। রাজ্য যেখানে শান্তির আশায় প্রজার উপর কঠোর দণ্ডের বিধান করিতে অগ্রবর্তী হইয়াছিল, বিপিনচন্দ্র নির্ভীক হৃদয়ে সেখানে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, এরূপ ব্যবস্থাদ্বারা দেশে ও জাতির মধ্যে অশান্তিই উৎপাদিত হয়। বিপিনচন্দ্রের এ রাজধর্মের অঙ্গীভূত সত্য আদর্শকে ও ন্যায়ধর্মকে ইংরেজ বিচারক হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে নাই। বিপিনচন্দ্রের জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু আজ পাশ্চাত্য সভ্যশক্তির সভ্যতাকে মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিপিনচন্দ্র যে সত্য প্রচার করিলেন, কঠোর সমালোচনা ও নির্ভীক হৃদয়ে শাসনের দোষ উদঘাটন করিয়া বিপিনচন্দ্র যে তেজস্বিতা দেখাইলেন, যে দীক্ষামন্ত্র আজ বিপিনচন্দ্র এদেশে প্রচার করিলেন, বিপিনচন্দ্রের সে দীক্ষামন্ত্র কি কোন ভারতবাসী ভুলিবেন?”

।।৩।।

বিপিনচন্দ্র পালের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা অভিযান অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। তার বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরেছেন বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি’ গ্রন্থে: “...মনে আগুন ধরে যেত বিপিনবাবু যে সময় সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে উঠে বলতেন, মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে আয়োজন ও প্রয়োজন মিলিয়ে যখন দেখি সংকল্প করা হয়েছে অথচ নৈবেদ্য যথেষ্ট নয়, তখন ভাবি দেশে আগুন লেগে গেছে, কিন্তু অভিভাবকদের মুখের দিকে তাকালে চলবে না। গ্রামে আগুন লাগলে লোকে কি করে? বালতি, কলসী, টিনের বিচার রাখে কি? তোমরা কি আসবে না, ভাই, এই গোলামখানার

মোহ কাটিয়ে? ওই একখানা চোতা কাগজের লোভে আকাশচারী হয়ে শুধু ভাগাড়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে? বয়কট করো ওদের স্কুল কলেজ। ইংরেজ জেলে দেবে? ইংরেজের জেলটা কত বড় ভাই? বাংলাদেশের চেয়ে কি বড়? সমগ্র জনতা নিস্তব্ধ মন্ত্রমুগ্ধবৎ। মনে পড়ছে সে সময়ের মনোভাব; সবাই অনুভব করত তখন যদি ইংরেজের সৈন্য ও পুলিস এসে গুলিগোলা চালাত, একজনও বোধহয় পালাত না।"* 'গোলামখানার কথা' শীর্ষক বৈঠকী কথায় স্বয়ং বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আধিপত্য নষ্ট হয়, তার জন্য তারা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় লাট কার্জন যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারকার্য্যে হাত দিলেন, দেশের লোকে বললে যে লাট সাহেব স্থানিভারসিটিগুলিকে গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্ট করে তুলতে চান। যেদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সংস্কার করবার চেষ্টা আরম্ভ হয়, সেদিনই আমরা বলেছিলাম, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কুলোচ্ছে না। একটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। Our reply to Lord Curzon's Universities Bill must be National University. National University কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কহিলাম A University based on National lines, working under National control, aiming at the realisation of National destiny – তাই National University। ইংরেজ এ দেশে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেগুলি প্রথমত: National Lines এর উপর গড়িয়া উঠে নাই; দ্বিতীয়ত: National control-এ নয়; কাজেই National destiny লাভের পক্ষে এগুলি সহায় হতে পারে না। ইংরাজ মুখে যাই বলুক না কেন, সত্য সত্য আমাদের মানুষ গড়ে তুলতে চায়নি, চেয়েছে কেবল কেরানী-ডেপুটি গড়ে তুলতে। তবে রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসনের জন্য কেরানী ডেপুটিরই প্রয়োজন, মানুষের তো প্রয়োজন নেই। যতদিন আমরা ইংরাজি শিখে ইংরাজের গোলামী করতে রাজি ছিলাম, যতদিন তার স্বভাব ও সভ্যতাকেই আমাদের পরম পুরুষার্থ বলে বরণ করে নিয়েছিলাম; ততদিন ইংরাজ চেয়েছে যে আমরা খুব লেখাপড়া শিখি। কিন্তু যেদিন ইংরাজ দেখলে যে তার বিদ্যা শিখে আমরা তার সঙ্গেই পাল্লা দিতে আরম্ভ করলাম, তার সমান হবার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ালাম, সেদিন আমাদের এ স্পর্ধা আর তার সহ্য হল না; তখন সে এই শিক্ষার বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। এই শিক্ষাতে আমাদিগকে অভদ্র করে তুলছে, আমরা oriental-দের বিনয় ও সৌজন্য হারিয়ে ফেলছি। আমরা গুরুজনকে আর মান্য করি না; সাহেব সুবোকে দেখলে সেলাম করি না। তাদের মর্মঘাতী চর্মপাদুকার স্পর্শকে আর পবিত্র বলে সর্বাঙ্গে মাখিয়া লই না। তখন এ শিক্ষাটা দেওয়া যে ভাল হয় নাই ইংরাজ বুঝল এবং তা উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা আরম্ভ করলো। লাট কর্জনের শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টার আড়ালে আমরা এই কথাটাই ধরলাম; আর তারই জন্য তাঁর ম্যুনিভার্সিটি বিলের তীব্র প্রতিবাদ হয়। তখনকার লাট কউন্সিলে পর্যন্ত এই বিলের সংশোধনের জন্য শতাধিক প্রস্তাব উপস্থিত হয়েছিল, একটাও গৃহীত হয় নাই। এই বিলখানা যখন পাশ হ'ল তখন আমরা ভাবলাম, এ য়্যুনিভারসিটিত গেছে; ওত আর আমাদের

জিনিষ নাই। তারই জন্য ত গোলামখানা বলে এটাকে ভাঙতে গিয়েছিলাম...।"[১৩] 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকাতে (১৯০১-০২) প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক দুটি ত্রুটি হচ্ছে, প্রথমত এই শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় নয়, দ্বিতীয়ত এ শিক্ষাব্যবস্থা যুক্তিসিদ্ধও নয়। বিপিনচন্দ্রের জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতায় মুখ্যত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচার লাভ করেছে।১৪ ১৯০৭ সালে মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের মধ্যে 'National Education' শীর্ষক বক্তৃতায় ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষানীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন: "The education that you have been receiving all these years has been shallow, and because of this fact, namely, that this education has been verbal education, it has no reference to things but words, it has helped to develop our memory but never our sense or understanding, as it ought to have done. And the result is not only that we have suffered in intellectual life, but we have suffered in our ethical, our artistic and our spiritual life as well. Our character has grown foreign tubs, not even in tubs but in orchids. Our manhood has been hung up on the verandah, having no roots in the actualities of our nation, and our life, in the past traditions of our race. We have grown like orchids, orchids grown on the verandah of a European Government. That is what our education has been..."[১৫] মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নৈতিক শিক্ষাকে সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

।।৪।।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রাঙ্গণে তাঁর উপস্থিতির মুহূর্তগুলি পরিষদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পরিষৎ পরিচালিত মহাবিদ্যালয় 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ' অধ্যক্ষের (Rector) দায়িত্ব পালন করেছেন, এর জন্যে তিনি কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার থেকে আয়োজিত প্রায় প্রত্যেকটি সভায় উপস্থিত থেকেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন। জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে কলা বিভাগের সদস্যরূপে সংস্কৃত, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। উপস্থিত থেকেছেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানেও। প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯০৮ সালের ১১ই মার্চ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানে সদ্য কারামুক্ত বিপিনচন্দ্র ছিলেন বিশেষ সম্মানিত অতিথি। বিরাট নৈশভোজের আয়োজন দেখে দীর্ঘদিন কারাগৃহের খাবারে অভ্যস্ত বিপিনচন্দ্র কৌতুক করে বলেছিলেন, 'জেলে ভরপেট খাবার অপ্রত্যাশিত কিছু পাওয়ার সমান ছিল।' এছাড়াও ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রবর্তিত এক্সটেনশন লেকচার (Extension lecture) কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৫১টি মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেছেন। নিম্নে বক্তৃতাসমূহের তালিকা দেওয়া হল :[১৬]

1923- Vaishnavism in Bengal (13 lectures)
1924- Development of Political Thought in Modern Bengal (7 lectures)
1925- Development of Political Thought in Modern Bengal (2 lect) cont'd from last year.
1926- Politics in Ancient India (6 lect.)
1926- Early History of English Education in Bengal (7 lect.)
1926- Early History of British Administration in Bengal (3 lect.)
1927- Early History of the British Administration in Bengal (1 lect) concluding lecture of the last year's series.
1928- Development of Thought and Political Life in Modern Bengal (9 lect.)
1929- Fundamentals of Politics (3 lect.) to continue in 1930 (১৯৩০ সালে বা তারপরে কোন বক্তৃতার উল্লেখ পাওয়া যায় নি)।

১৯০৭ সালে মাদ্রাজে প্রদত্ত 'National Education' শীর্ষক বক্তৃতায় জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "... The income from endowed funds of the National Council of Education of which I have the honour to be a member, is just now rupees sixty thousand. It is not a large sum for a National University, but, we hope, in course of time, as we are able to prove by the results, the superiority of the education that we seek to impart to our youth, funds will be forthcoming[১৭] ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২০মে কর্মযোগী বিপিনচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রাঙ্গণে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার কথা স্মরণ করে শোকপ্রস্তাবে লেখা হয় : "The Committee places on record its deep sense of sorrow and loss sustained by the Council at the death of Babu Bipin Chandra Pal who was one of the founder members and was for sometime a Rector of the Council. He was a sincere patriot and a clear and independent thinker. His speeches and writings by stimulating the national spirit at the time greatly helped the work and organisation of the Council."

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে দেশপ্রেমী, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী মননশীল ব্যক্তিত্ব, অদ্বিতীয় বাগ্মী ও ক্ষুরধার লেখনী সঞ্চালক, লেখক হিসেবে বিপিনচন্দ্র পালের উপস্থিতি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অজস্র জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে ঘনঘন মিলিত হয়েছেন বৈঠকে, সভাসমিতিতে। লিখেছেন অসংখ্য, সম্পাদনা করেছেন একের পর এক নামীদামী পত্রিকা। নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে হাসিমুখে কারাবরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ আজীবন অটুট রেখেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে তাঁর নাম আজও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। বিপিনচন্দ্র পালের শতবর্ষে পদার্পণ ও শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রকাশ করেছে অত্যন্ত মূল্যবান

দুটি গ্রন্থ- The Origins of the National Education Movement (১৯৫৭ এবং ২য় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০০) এবং Studies in the Bengal Renaissance (১৯৫৮)।[১৯] দুটি গ্রন্থই বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। লাল-বাল-পালের স্মৃতিতে উৎসর্গিত প্রথম গ্রন্থটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য ছিল। ছাত্রছাত্রীরা যাতে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার ডঃ ত্রিগুণা সেন গ্রন্থটিকে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন।

শতবর্ষে (২০০৫) শিক্ষা পরিষদের নবনির্মিত 'হেরিটেজ হল'-এ যথোচিত মর্যাদায় স্থান পেয়েছে বিপিনচন্দ্রের আবক্ষমূর্তি। যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে তাঁর রচনাসম্ভার, প্রকাশিত হয়েছে প্রতিষ্ঠাতৃপিতাদের জীবনীসম্বলিত গ্রন্থ 'শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি', রবিসন্ধ্যা মঞ্চে আয়োজিত হয়েছে বক্তৃতা। পরিষৎ প্রাঙ্গণে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ও অবদানের কথা স্বরণ করে সার্ধশতবর্ষ স্মরণ অনুষ্ঠানের এই পুণ্যলগ্নে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করছি।

তথ্য সূত্র:

১. স্মৃতিকথা রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ: ১৩৯, জন্মশতবার্ষিক সং, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২. ভারতকোষ ৫ম খন্ড ১৩৮০, পৃ: ৯২-৯৩; সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, ২য় সং ১৯৮৮, পৃ: ৩৪৮-৪৯

৩. বঙ্গবিভাগের চূড়ান্ত খবর ঘোষিত হলে স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, পাইওনীয়ারের মতো ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। সেই সময় স্বদেশীচেতনার প্রচারে ডন, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, নিউ ইন্ডিয়া, হিতবাদী, সঞ্জীবনী, সন্ধ্যা, যুগান্তরের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪. ড. শিবদাস চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল জীবন, সাহিত্য ও সাধনা, ১৯৭৩, পৃ: ১৩৫ - ৩৬

৫. গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃ: ৬২৫, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮

৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬২৭

৭. Amalendu De, Raja Subodh Chandra Mallik and His Times, National Council of Education, Bengal, 1996, p. 61.

৮. Prof. Haridas Mukherjee & Prof. Uma Mukherjee, The Origins of the National Education Movement, National Council of Education, Bengal, 2nd Revised ed.2000, p. 35.

৯. Ibid, p. 37.

১০. যুগান্তর ২১ মার্চ ১৯০৮, অগ্নিযুগের অগ্নিকথা 'যুগান্তর', সংকলক ও সম্পাদক অংশুমান বন্দোপাধ্যায়, ২০০১, পৃ: ৮০০ - ৮০১.

১১. প্রাগুক্ত

১২. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, ১৯৮৩, (৩য় মুদ্রণ), পৃঃ ১৯৩,

১৩. বিপিনচন্দ্র পাল, বৈঠকী কথা গোলামখানার কথা, বঙ্গবাণী, ২য় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩০, পৃঃ ৩৪০-৪১

১৪. ড. শিবদাস চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল: জীবন, সাহিত্য ও সাধনা, ১৯৭৩, পৃঃ ৪০

১৫. Bipin Chandra Pal, 'National Education', Swadeshi and Searaj, 1954, pp. 256 - 57

১৬. Reports (Annual) of the National Council of Education, Bengal (1923-29)

১৭. 'National Education', p. 266

১৮. Report of the National Council of Education, Bengal, 1932

১৯. i) Prof. Haridas Mukherjee & Prof. Uma Mukherjee, The Origins of the National Education Movement, National Council of Education, Bengal, 1957, Revised ed. 2000.

(ii) Studies in the Bengal Renaissance National Council of Education, Bengal, First published December, 1958, 1977 (2nd ed.), 2002 (3rd ed.).

মায়া ভট্টাচার্য : বর্তমানে কলকাতার যাদবপুরে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনাধীন 'যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা'-র তত্ত্বাবধানকার্যে নিযুক্ত। পিতা যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৯০) ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও প্রাচীন পুথির সংগ্রাহক ও গবেষক। ১৯৮৪ সালের ১১মে যতীন্দ্রমোহন তাঁর নিজস্ব মূল্যবান পুথিপত্রের সংগ্রহটি 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'-কে দান করেন। এই সংগ্রহ 'যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা' নামে নামাঙ্কিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের দুই পুত্র ও তিনকন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা মায়া ভট্টাচার্য ১৯৭৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৮৫ সালে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্র' বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ,ডি উপাধি লাভ করেন। ইদানীং কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলাপ্রবন্ধ লিখে থাকেন।

বিপিনচন্দ্র পাল : রাজনীতির মঞ্চে এক আপোসহীন ব্যক্তিত্ব

মনোলীনা নন্দী রায়

উনিশ শতক ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা উন্মেষের এক যুগান্তকারী শতক। মধ্যযুগীয় নানাবিধ সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যারা তাঁদের নিষ্ঠা ও কঠোর ত্যাগের দ্বারা দেশ ও জাতিকে নবদিগন্তের সন্ধান এবং আধুনিক ভারতবর্ষে নবজীবনের বীজ-বপন করেছিলেন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ নিঃসন্দেহে সেই নবযুগের সর্বজন স্বীকৃত রূপকার। সেই নবজীবনের বীজকে মহীরুহে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে এবং স্বাধীনতার প্রেরণাকে রাষ্ট্রীয় মুক্তির পথে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিকাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের জন্য যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বৃহৎ বঙ্গের এক প্রান্তিক অঞ্চল শ্রীহট্টের গোঁড়া হিন্দু পরিবারের এই সুসন্তান তাঁর বাগ্মিতা, স্বাজাত্যাভিমান, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির ফলস্বরূপ অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনীতির মঞ্চে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অকুতোভয় এই দেশপ্রেমিক জাতীয় আন্দোলনের সূচনাতেই দেশবাসীর সামনে এক নূতন যুগের বার্তা তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে। লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহের সূচনা হয় শ্রীহট্টে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। স্কুলের ম্যাগাজিন এবং স্থানীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি হয় সাপ্তাহিক 'পরিদর্শক' সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়ে। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় থাকাকালীন বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্টের আরেক সুসন্তান ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁরই সহায়তায় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের গুণিজনদের সংস্পর্শে আসেন এবং খুব অল্পদিনের মধ্যে ব্রাহ্ম ভাব-ধারা তাঁর চিন্তায় ও কর্মে এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশভক্তি, নবগোপাল মিত্রের স্বাজাত্যাভিমান, শিবনাথ শাস্ত্রীর রাষ্ট্রীয় মুক্তির চিন্তা তাঁর অন্তরে এক প্রবল প্রেরণা যোগায়।

জাতীয় আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন প্রগতিশীল গোষ্ঠীর নেতা। জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ থাকার ফলে সুরমা উপত্যকার নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে শ্রীহট্ট অঞ্চলের আরেক কৃতী সন্তান কামিনীকুমার চন্দ সংস্কারপন্থী এবং নরমপন্থী এই দুই ভাবধারায় প্রভাবিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার ফলে এক সময় এই দুই বিপরীতমুখী ভারতীয় রাজনৈতিক মতবাদকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছিলেন খুব সাফল্যের সঙ্গে। চরমপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী বিপিনচন্দ্র তাঁর দুই সহকর্মী মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী ছিলেন। এই দুই চরমপন্থী নেতা জাতীয়তাবোধের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদকে জাতীয় আন্দোলনের হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বিপিনচন্দ্র আধুনিক ভারত গঠনের সংজ্ঞা তাঁর ‘New India’ পত্রিকাতে তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায়, “This new India is neither Hindu nor Mohamedan nor British, but is made up one of the varied and valuable materials supplied in successive stages of its evolutions by the three great world civilizations, which the three great sections of present Indian community represent”[১] এই উক্তি থেকে স্পষ্টতই প্রকাশ পায় যে, বিপিনচন্দ্র ভারতীয় সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জাতি-ধর্ম-গোষ্ঠীর সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে নবভারতের সূচনা হবে, তার বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল-- ‘composite patriotism of all diverse elements appropriate to a nation composed of various races, cultures and creeds.’[২]

জাতীয় চেতনাকে দুর্বল করার দুরভিসন্ধি নিয়ে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাই, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছিল আঞ্চলিক আবেগকে কেন্দ্র করে। বিপিনচন্দ্র পাল এবং সহকর্মীরা এই আন্দোলনকে বাংলার গণ্ডী অতিক্রম করে জাতীয় স্তরে এক গণমুখী আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়, -- “We wanted to divert the Congress movement on to new lines which the classes and masses did not stand apart, an objective which in our opinion the Congress had so far failed to achieve.” উল্লেখ্য যে, জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্ব (গোখলে প্রমুখ) ১৯০৫ সালে বারাণসী অধিবেশনে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকে বাংলার সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর শাণিত লেখনী এবং জ্বালাময়ী ভাষণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জনচেতনা উন্মেষের উদ্দেশ্যে সভা করেন। তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতার এক নূতন স্বপ্নে আবিষ্ট হয়। Rudolf Alps তাঁর সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করেন, “Pal has no doubt sown a powerful and bad seed which has fallen on fertile ground and is beginning to grow at some places more rapidly than one was inclined to think.” বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশ ও জাতি যখন উত্তাল হয়ে ওঠে, বিপিনচন্দ্র রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকাটির সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে এই ইংরাজি দৈনিক পত্রিকাটি স্বাধীনতা আন্দোলনের এক প্রধান হাতিয়াররূপে পরিগণিত হয়। দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ‘Bedrock of Nationalism’ নামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাঁর বক্তব্য, “for the spirit is the bedrock of our national movement. It is the life of this spirit that we are seeking through our economic organisation and political activities”. তাঁর মতে, এই জনজাগরণ মহৎ আত্মত্যাগের জাগরণ এবং এই আত্মিক জাগরণের গতিকে বলপ্রয়োগ কিংবা কোন ছলচাতুরী দ্বারা রোধ করা অসম্ভব। বিপিনচন্দ্র তাঁর ব্যতিক্রমী ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা স্বদেশী

আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিলেন। প্রাক্-গান্ধিযুগে যে সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক ও আর্থিক চিন্তার সমন্বয় সাধন করে নিজস্ব প্রতিভার দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ রেখে গেছেন, বিপিনচন্দ্র পাল নিসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দাদাভাই নওরোজির (১৮২৫-১৯১৭) মতে বিপিনচন্দ্র আর্থনীতিক চিন্তাকে কখনোও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তা থেকে আলাদা করে দেখেন নি এবং দুয়ের সমন্বয়ে ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যাঁরা 'আগে স্বাধীনতা পরে আর্থিক উন্নয়ন' এই দর্শনে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় চিন্তায় বিশ্বাসী বিপিনচন্দ্রের প্রকাশ্য মতভেদ দেখা দেয়। ফলে তাঁর যুক্তি, দর্শন এবং বলিষ্ঠ গ্রন্থনা তাঁকে জাতীয় নেতৃত্বের পুরোভাগে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিছু মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯০৬-এর জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেছিলেন---"It is impossible to work out a divorce between politics and economics, politics and industrial advancement in India. Swadeshism must associate itself with politics and when Swadeshism associates itself with politics, it becomes boycott, and this boycott is a movement of passive resistance" বিপিনচন্দ্রের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল, অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হবে সম্পদ উৎপাদন এবং তার যথার্থ বণ্টন। পুঁজিবাদী উন্নত দেশে সম্পদ উৎপাদনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সামাজিক কল্যাণ ও সুষম বন্টনের কথা তারা চিন্তা করেন না। বিপিনচন্দ্রের স্বদেশী ও বয়কট তত্ত্বের নিজের ব্যাখ্যা ছিল, অন্ধমোহে পাশ্চাত্যের বৃহৎ ধাঁচে উৎপাদিত দ্রব্যের নির্বিচার আমদানি করলে ভারতের যুগযুগান্তের আর্থিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়বে। তবে নির্বিচার বয়কট ভারতের আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হবে না। সুতরাং সুনিশ্চিত নির্বাচনের মাধ্যমে সেগুলোকেই আমদানি করতে হবে যেগুলো দেশীয় শিল্পের কাঠামোগত ভিত মজবুত করবে এবং আধুনিক ধারার সঙ্গে আমাদের গ্রামীণ আর্থিক বিন্যাসকে সমন্বিত করে ভারতের উপযোগী একটি মিশ্র আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। আজকের মুক্ত অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাবের ফলে আমাদের কৃষিব্যবস্থা, কুটির শিল্প যেখানে সঙ্কটের সম্মুখীন, যেখানে তা আমাদের সনাতন আদর্শ, ধ্যান, ধারণা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বুনিয়াদকে শিথিল করে দিচ্ছে, সেখানে বিপিনচন্দ্রের এই সুদূরপ্রসারী চিন্তা বর্তমান আর্থনীতিক পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবনের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

সুমিত সরকার তাঁর 'Swadeshi Movement in Bengal' গ্রন্থে উল্লেখ করেন "The intellegentsia of the Swadeshi age was very much a product of Western education. Yet a revulsion against Western education was to become a major trend in the Swadeshi movement, taking the two forms, namely boycott of official schools and colleges and establishement of a parallel and independent system of national education."" স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া দিয়ে দলে দলে ছাত্ররা সরকারি স্কুল এবং কলেজ বর্জন করে। বিপিনচন্দ্র ভবিষ্যৎ যুব সমাজের কথা মাথায় রেখে জাতীয় স্কুল গঠনের চিন্তা করেন। সমস্ত দেশে তাঁরই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের কৃতী

শিক্ষকেরা সরকারি চাকুরি ছেড়ে এই সমস্ত ছাত্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয়ে অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন।

উনিশ শতকের বাংলার ঔপনিবেশিক পরিবেশে নানা কারণে সামাজিক পরিবর্তনের জোয়ার আসে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে এবং নারীসমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা হয়। তার সূচনা হয় বাংলায় এবং সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন ব্রাহ্মরাই। যদিও এই কর্মকাণ্ড কিছু পরিমাণে কলকাতার বা অন্য শহরের মাত্র, তাও ব্রাহ্ম বা খ্রিস্টানদের মধ্যে; বৃহত্তর হিন্দু বা মুসলমান সমাজে তার প্রসার ছিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খুবই নগণ্য। সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষিত উচ্চশ্রেণির মধ্যে বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও। তবু পথিকৃৎদের মূল্য অপরিসীম। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ফলেই তো বিশ শতকের অধিকতর সুস্থ আবহাওয়া তৈরি হতে পেরেছিল। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা, পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিতে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ব্রাহ্ম ভাবাদর্শে বিপিনচন্দ্র তাঁর উদারদৃষ্টি দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে নারীসমাজের অংশগ্রহণের যথার্থতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁরই মতো প্রগতিপন্থী কিছু মহান ব্যক্তিত্বের আগ্রহ আতিশয্যে বাঙালি নারীসমাজ স্বদেশী পর্বে জাতীয় কাজে এগিয়ে আসে। স্বদেশীযুগে মহিলাদের আত্মবিকাশের পথকে সুবিন্যস্ত করার তাগিদে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে হস্তশিল্প মেলার আয়োজন করা হয়, যদিও শিল্পীকে প্রকাশ্য দিবালোকে আনা হয়নি সামাজিক বিধিনিষেধের জন্যে। ১৯০৬ সালে বিপিনচন্দ্র শিলচর আসেন। তাঁর বাগ্মিতার কথা এই প্রান্তিক অঞ্চলের মহিলাদের অজানা ছিল না। তাঁরা বিপিনচন্দ্রের বক্তা শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁদের এই আকাঙক্ষা পূরণের জন্য শিলচর উকিলপট্টিতে মহেশচন্দ্র দত্তের বাড়িতে চিকের আড়ালে থেকে মহিলাদের বক্তব্য শোনার আয়োজন করা হয়। সমস্ত প্রচলিত রীতি-নীতি বিধিনিষেধের বেড়াজালকে অতিক্রম করে অভিজাত পরিবারের মহিলারা তাঁর বক্তব্যের প্রভাবে শুধু উদ্বুদ্ধই হলেন না, এই বিশেষ দিনটিতেই তাঁদের বোধোদয় হল। এ যেন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার স্মরণীয় দিন, যেন চূড়ান্ত মুহূর্ত। নি:সন্দেহে, সুরমা উপত্যকার মতো প্রান্তিক অঞ্চলের মহিলাদের এই ঐকান্তিক ইচ্ছাপূরণ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে মহিলাদের সংযোজনে এবং নারীসমাজের বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে পরিচয়ের দ্বারা নতুন এক অধ্যায়ের দ্বার উদঘাটিত হল।

বিপিনচন্দ্রের বিদ্রোহী সত্তার আরও এক ব্যতিক্রমী পরিচয় পাই বিখ্যাত ‘বন্দেমাতরম’ মামলায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাতীয় চেতনার গতিকে স্তিমিত করার লক্ষ্যে অরবিন্দ ঘোষকে ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকায় শাসকবিরোধী লেখার জন্য রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী করে। জাতীয় চেতনার গতিকে সচল রাখার তাগিদে অরবিন্দ বন্দি হওয়ার পর পুনর্বার সম্পাদনার কাজে যোগ দেন। অরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলায় রাজসাক্ষী না হওয়ার অপরাধে আদালত অবমাননার দায়ে তাঁকে ছয়মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং বৃহত্তর স্বার্থে আত্ম-বিসর্জনের যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন, আজকের সামগ্রিক

পরিস্থিতির বিচারে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

সুরাট কংগ্রেসের বিভাজনের প্রতিক্রিয়ায় বিপিনচন্দ্র সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। এই থেকে ধীরে ধীরে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি কমে যেতে থাকল। এই সময় লেখাই ছিল তাঁর মুখ্য কাজ। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে পড়ে দেশের আর্থিক চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তথাপি লেখনীর মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে 'Swaraj' ও 'Indian Student' নামক দুখানা পত্রিকা বের করেন। ১৯০৮ সালে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বিলাত যাত্রা করেন এবং স্বাধীনতার জন্য জোর প্রচার শুরু করেন। সেই সময় স্বরাজে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ লেখার অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯১৬ সালে বিপিনচন্দ্র পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে মতিলাল নেহেরুর অনুরোধে তাঁরই পরিচালিত পত্রিকা 'Independent'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্মরণীয়, মতিলাল নেহেরু সেই সময় তাঁর কিছু ব্যক্তিগত শেয়ার জাতীয় সাময়িক পত্রিকায় বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন। কিন্তু লগ্নীকারীর অভাবে তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেই মুহূর্তে বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করা মতিলালের কাছে এক পরম প্রাপ্তি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে গান্ধিজির সঙ্গে নীতিগত কিছু প্রশ্নে বিপিনচন্দ্র পালের মতবিরোধ হয়। মতিলাল নেহেরু তাঁকে গান্ধি-বিরোধী লেখা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করায় তিনি 'Independent' পত্রিকার সম্পাদনার দায়ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। পরিণামস্বরূপ ভারতবর্ষের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস তাঁকে সক্রিয় সংগঠনের ভূমিকা থেকে অনেকটা নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তথাপি নিজ সিদ্ধান্তে অটল ও স্বীয় আত্মবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত বিপিনচন্দ্র দেশ ও বঙ্গজননীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার সাক্ষ্য রেখে গেলেন লেখায় ও বক্তব্যে। গান্ধিজির সঙ্গে তত্ত্বগত ও আদর্শগত বিরোধের সূত্রপাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি গান্ধিজি পরিচালিত আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও বিশালতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেজন্যই তিনি একে খাটো করে দেখতে চাননি যদিও তাঁর সহজাত কিছু দ্বিধা তাঁকে এর ফলাফল সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। স্বদেশী-উত্তর বাংলায় যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে কিছু সমস্যারও উদ্ভব হয়। সরকারি নিপীড়নের নিষ্ঠুরতা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, বিকল্প স্বদেশী আদর্শের অনুপস্থিতি, নৈরাশ্য স্বভাবতই তাঁর মতো চিন্তাশীল মানুষকে বিচলিত করে। সেই সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে বাংলার ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়েও তাঁর মধ্যে একটা শঙ্কা ছিল। তাঁর ধারণা ছিল, গান্ধিজির নৈজুয্য-পন্থার প্রস্তাবনা বাংলার তরফ থেকে প্রত্যাখাত হবে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেসে অসহযোগের প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর ভাষায় 'This vote has saved the face of Bengali' তাঁর এই শঙ্কা অমূলক ছিল না। বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়েছিল। পরিণামে ঔপনিবেশিক শক্তির প্ররোচনায় বাঙালি জাতীয় সত্তায় যে ফাটল সৃষ্টি হল, সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলার পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধির নৈযুজ্য-পন্থার সঙ্গে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও

বাংলার সময়োপযোগী সাড়া তাঁকে নিশ্চিত করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় যে জাগরণ হয়েছিল, বিপিনচন্দ্র পাল নি:সন্দেহে সেই সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্মেষের এক সফল প্রবক্তা। যদিও জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের বিবর্তন সরলরেখানুগ হয়নি,হয়েছে আঁকাবাঁকা, বক্র রেখানুগ এবং কোথাও তা ঊর্ধ্বগ হয়েছে। তেমনি কোনো কোনো পর্বে তা সমান, গুরুত্ব ও পরিমাপে নিম্নগও হয়েছে। এই বক্র রেখানুগের বিবর্তন কোথাও তাঁকে স্বীকৃতির চূড়ান্ত শিখরে নিয়ে গেছে, আবার কোথাও চরম নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সমস্ত স্ববিরোধ এবং বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাঁর প্রয়াণের দীর্ঘকাল পরে আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর আনুভূতিক প্রতিক্রিয়া এত নির্ভীক এবং স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সকল শ্রেণির মানুষের অভ্যুদয়ে তাঁর লড়াই এমন ঐকান্তিক যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির মঞ্চে তাঁর এই আপোসহীন সত্তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে নবভারতের এক একনিষ্ঠ সাধকের মর্যাদা দান করেছে। দেশমাতৃকার প্রতি তাঁর আন্তরিক অকৃত্রিম ভালোবাসা তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে :

"এ জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি ইহা সৌভাগ্যের কথা। আবার যদি এই সংসারে জন্মিতে হয়, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষে জন্মিতে চাই, সুখ-সমৃদ্ধিশালী অন্য কোনো দেশে জন্মিতে চাহি না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্বোপরি এই বাংলাদেশে এ যুগে জন্মিয়াছি ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয় এ যুগে এই বাংলাদেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি, এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।"* মাতৃভূমির প্রতি তাঁর এই আকৃতি এমন ঐকান্তিক যে এই আপোসহীন সত্তাই দেশের অত্যাশ্চর্য রাজনৈতিক সম্পদ।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১.	গ্রোভার, বীরেন্দ্র (১৯৯৩): বিপিনচন্দ্র পাল, নিউদিল্লি।

২.	ভট্টাচার্য, বিনয় ভূষণ (সম্পাদিত) ২০০৭: ইন্ডিয়াস ফ্রিডম মুভমেন্ট, নিউদিল্লি।

৩.	তদেব

৪.	সোব্বা রাও, কে শ্রীরজিনী (১৯৮৯): স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম, নিউদিল্লি।

৫.	পাল, বিপিনচন্দ্র (১৯54) স্বদেশী এন্ড স্বরাজ, কলকাতা।

৬.	দাস, সুশান্তকৃষ্ণ (২০02): বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিভার একটি অবহেলিত দিক, স্মরণিকা, রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, করিমগঞ্জ।

৭. সরকার, সুমিত (১৯৮৬): স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, নিউদিল্লি।

৮. পাল, বিপিনচন্দ্র (২০০৫) সত্তর বৎসর, কলকাতা।

মনোলীনা নন্দী রায় : বর্তমানে করিমগঞ্জ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা মনোলীনা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে **১৯৮৮** সালে স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করেন। বরাক উপত্যকায় স্বাধীনতা-পর্বে কংগ্রেসের আন্দোলন বিষয়ে **১৯৯২** সালে তিনি এম. ফিল করেন। তাঁর পি.এইচ.ডি. (২০০৬) গবেষণানিবন্ধের বিষয় ছিল 'Contradictions and Conciliation between Nationalism, Regionalism and Localism: Political Response of Barak Valley to the Colonial Rule (1874-1947).'

পুনর্মুদ্রণ

এখানে বিপিনচন্দ্রের একটি বক্তৃতা ও তিনটি স্মৃতিচারণমূলক রচনা পুনর্মুদ্রিত হল। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে Arms Act প্রত্যাহারের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে বিপিনচন্দ্র যে বক্তব্য রাখেন, তারই লিপিরূপ 'Writings and Speeches, Vol. I' গ্রন্থটি থেকে পুনর্মুদ্রিত হল। ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ সালে বিপিনচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জ্ঞানাঞ্জন পালের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

জীবন-সায়াহ্নে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনদিনের পিতৃস্মৃতি আশ্রয় করে বিপিনচন্দ্র তিনটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ রচনা করেন। বিপিনচন্দ্র পাল উন্নয়ন ও গবেষণা পরিষদের পক্ষে বিপিনচন্দ্রের পৌত্র শ্রীমানবেন্দ্র পালের সৌজন্যে 'সাহিত্য ও সাধনা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত এই তিনটি রচনা এখানে পুনর্মুদ্রিত হল। --সম্পাদক

SPEECH ON CONGRESS RESOLUTION FOR THE REPEAL OF THE ARMS ACT (1887)

Bipin Chandra Pal

At the third session of the Indian National Congress held at Madras in 1887, Sri Bipinchandra Pal, being called upon to second the Resolution on the Arms Act, spoke as follows : —

"Mr. President and Brother Delegates, I thank you, Sir, for the great honour you have done me by calling upon me to second this Resolution, and I do so with great pleasure. I know, Sir, that I have not the ability, the experience and the weight of authority with which the seconders and supporters of previous Resolutions have spoken. But if unselfish motives go for anything then I do claim that I am the fittest person to second this Resolution (laughter and applause). Because I am sure that if, during our life-time and Mr. Banerjea's, our dreams of a reformed representative legislature be ever realized he will be about the first man that will be elected to it (laughter and applause). And Mr. Norton has done so much for Madras and the Madrasees, and he is so very popular here, (applause) that I am sure that if our Madras friends have a representative legislature of their own, Mr Norton will be as much welcome to a seat there as any native gentleman of equal qualifications (laughter).

When Raja Rampal Singh proposed the resolution regarding the volunteer question, I will not say that he could completely shut his eyes to the fact that if ever we had such a corps we would vote him our Captain (laughter and applause). And when Mr. Subramanyam and Mr. Kalicharan Banerjea proposed the divorce of the judicial and the executive functions of the magistrates, I am not sure that they were not aware of the fact that if they succeeded in their Resolution, their professional duties would be made much easier and simpler than now (applause).

But, gentlemen, I do not think that even my rankest enemy could attribute motives to me (cheers). The Resolution which I now press for your acceptance, accepted, not only by you all but the Government also, will bring me no special good. For, I am sure, gentlemen, that I shall never have the unpleasant necessity of using my arms in my life (laughter and applause), except my steel pen and my sharp tongue (laughter) which, I believe, are not included in the schedule to Arms Act. Allow me to say, Sir, that the admirable tact and judgment with which you have conducted this meeting (applause) under very difficult and trying circumstances have been thrust entirely in the shade by the wonderful sagacity you have just displayed in calling upon me, a puny, weak Bengalee, to second the prayer of the Congress for the repeal of an Act which does not stand in the way of my personal ambition or employment (applause), and which, if repealed will serve me no personal ends. But there may be, ladies and gentlemen present here who may not see my fitness to second this Resolution so clearly as the President does and they may therefore like to know what right have I to second this Resolution.

“Loyalty to British Government”

My right consists in my sincere loyalty to the British Government (applause). My motives for seconding this Resolution are to be found in my earnest, ardent and sincere desire for the welfare of the Government under which I live. I am one of those who believe in the workings of a benign Providence in human history. But never did I so plainly recognise the hand of Divine Mother in the present history of my beloved country as when I entered this vast and sacred assembly and took my seat there as an humble delegate of this Congress. As I stand upon this platform, and looking round me, see the immense crowd of men, the Mahratta, the Punjabee, the North Westerner, the Parsee, the Bengalee, sitting in the midst of hospitable Madrasees, the beaming faces, the deafening cheers, the flow of brotherly Love, the exchange of friendly greetings, the eloquent smile, the hearty handshake, the maddening enthusiasm and the earnest patriotism of this vast assembly, all combine to inspire me with a feeling of gratefulness, the like of which I could never experience elsewhere, and when standing on this platform, and even while sitting there, in the midst of this vast assembly, many a time my heart has gone out to my God to offer Him its humble tribute of gratefulness for all the blessings which He has in store for my beloved Fatherland, and the faintest indications of which are to be seen here in this hall (applause).

And I thank Him for having brought the English Government to this country to work out our salvation (applause). Such being my feelings, and I have not the slightest doubt that such are also the feelings of each and all of my brother delegates here (applause), is it anything strange that I should be loyal to the British Government ? I utter the barest truth when I say that I am loyal to the British Government. It is not the language of dissimulation. I hate dissimulation (applause). It is not the language of false diplomacy. I hate that diplomacy which is not based on truth (applause).

I am loyal to the British Government, because with me loyalty to the British Government is identical with loyalty to my own people and my own country. I am loyal to the British Government because I believe the British Government to be an instrument in the hand of God for the salvation of my people (applause); I am loyal to the British Government because I love self-government (applause); I am loyal to the British Government because I love this Congress.

I confess, Sir, that I am a Radical and a Democrat. But strange to say my radicalism and my democracy have both combined to make me a sincere well-wisher of British Government (applause). And, gentlemen, the love that I have for the British Government compels me to condemn strongly the suicidal policy enunciated in the Arms Act and to call for its repeal. The Resolution which I am here to second seems, Sir, to be slightly different from those that have gone before it. The supporters of those Resolutions appealed on behalf of the people to the Government. But I appeal on behalf of the Government to itself. It is not for me to say, Sir, that this Act does not operate to the injury of the people. When I remember that, year after year ravages of wild beasts are increasing with alarming rapidity, when I remember that thousands of my countrymen and country-women are every year killed by tigers and leopards, when I find poor cultivators everywhere appealing to Government to protect their crops from the ravages of wild animals, — for the Arms Act has deprived them of the means by which they could protect their crops themselves when I look to all these facts, how can I say that this Act does not operate against the life and property of the people.

But excuse me, gentlemen, for saying that the direct injury which the law does to the people simply dwindles into insignificance before the immense harm that it is doing to the Government itself. We are very frequently told, Sir, that the Government must maintain its prestige.

But I can never fully understand the meaning of the prestige of the Government in the face of this obnoxious Act. If you have really any prestige, why then that ought in itself to be a tower of strength to you, which needed no Arms Act, and the consequent disarming of the whole nation to keep it up. It appears to me, gentlemen, that like some lowcaste men suddenly grown rich and placed in honourable position, who are ever anxious to keep up their position, because they ever suspect that they have really no solid basis for that position-our Government also in their extreme anxiety to preserve their prestige betray their weakness only (applause and laughter).

I am not destined to be a military man; and it is not for me to say what injurious effect the disarming of the nation is exercising upon the people of the country by demartialising them. I am a peace-loving Bengalee, who is living in comfort and security under the protection of the British Government; and to my mind the most injurious effect of the Arms Act consists in the temptation that it is holding out to Russia to come and invade India. I am not a Russophobe, gentlemen. God save me from that dire disease. I do not believe that Russia's advance has been actuated by a policy which has the invasion and conquest of India as its ultimate end. But if ever Russia comes and puts in her appearance at our North-Western frontier, she will be brought there by the Arms Act.

What, I ask, are all our professions of loyalty worth in the face of the Arms Act ? The Nizam may offer sixty crores instead of sixty lakhs for the defence of the Empire ; ten thousand jubilee demonstrations may be organised; the Government may publicly acknowledge the sincerity of these loyal demonstrations; British newspapers may trumpet them forth to the whole world. But the question is, will foreigners believe, will Russia believe in the truth and sincerity of these demonstrations in the face of the Arms Act? Would she not put the unpleasant question if the people of India are loyal, and if you believe them to be so, why do you desire the disarming the entire population there? So long as this Arms Act exists, nothing will convince outside people that the British Government feel themselves strong in the loyalty of subjects. You know, Sir, that the Russian war-party set considerable store by the supposed disaffection and disloyalty of the Indian people. And if ever Russia makes bold to invade India, the Arms Act, I repeat, will be her chief temptation.

Her Majesty has most solemnly declared that in our contentment she will find her principal strength. Why then do her Indian Government ignore our loyalty and our contentment, and set up the flimsy bulwark of a disarming law for the safety of her Indian Empire? The policy of the Arms Act, Sir, is wrong in principle injurious in its effect and is simply suicidal to the Government; and as such in the interest of that very Government whose safety it seeks to secure, it should at once be repealed (loud and prolonged cheers).

প্রাণতুল্যেষু

বিপিনচন্দ্র পাল

আমার বাবা চিঠিপত্র লিখিবার সময় আমাকে ‘প্রাণতুল্যেষু’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলাম বটে, কিন্তু কোন দিন আমাকে ‘আদুরে ছেলের’ মত লালনপালন করেন নাই। বেশী আদর দিলে ছেলে বিগড়াইয়া যায় এ ধারণাটা তাঁর খুবই ছিল। সন্তান-পালন সম্বন্ধে তিনি চাণক্যনীতির অনুসরণ করিয়া চলিতেন। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সেজন্য লালন করিয়াছিলেন। যখন যাহা চাহিয়াছি, অনেক সময় তাহা পাইয়াছি। তিনি প্রাত:কালে যখন আপনার কাজকর্ম করিতেন, আমি পলো চাপা থাকিয়া তাঁর কাছে বসিয়া রহিতাম। একটু বড় হইলে, পলো চাপা দেওয়া অনাবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন তাঁরই পাতে বসিয়া খাইতাম। তাঁরই মতন কাপড়চোপড় পরিয়া আহারান্তে তাঁর সঙ্গে চাকরের কোলে চড়িয়া কাছারি যাইতাম এবং তাঁর এজলাসে, তাঁরই চৌকির মতন একটা চৌকিতে বসিয়া ‘গবর্ণমেন্ট গেজেটের’ পাতা উল্টাইতাম। এ-কে যদি আদর বলে, তবে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত এভাবে কতকটা আদুরে ছেলে ছিলাম, এমন বলাও বা যাইতে পারে।

কিন্তু এই আদরটুকু বেশী দিন পাই নাই; ‘লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি’-চাণক্যের এই আদেশ। তার পর ‘দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ’-দশ বৎসর কাল তাড়নার অবস্থা। পাঁচ বৎসর পার হইলে, আমার উপর এই সনাতন ব্যবস্থার প্রয়োগ আরম্ভ হইল। চাকরের কাঁধে চড়া বন্ধ হইল। কাছারিতে যাইয়া এজলাসে বসিয়া হাকিমের অভিনয় করা শেষ হইল। হাতে খড়ি হইবার পর হইতেই, সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে, পিঠে বাড়ি পড়িবারও প্রশস্ত আয়োজন আরম্ভ হইল। শুনিয়াছি, হাকিমি অবস্থায় এজলাসে নাকি বাবা অতি সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিচার করিতেন। কিন্তু আমার উপরে দণ্ড বিধানের বেলা প্রায়ই এই সূক্ষ্মতা ও নিরপেক্ষতা দু-এরই একান্ত অভাব হইত বলিয়া অন্তত: আমার ধারণা হইয়া গিয়াছিল। তাঁর এজলাসে অপর লোকের বিরুদ্ধে নালিস রুজু হইলে, অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার জন্য অনেক সাক্ষী-সাবুদের আবশ্যক হইত। আমার বেলা কোন অপরাধের কথা পেশ হইলে কোনো সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন হইত না; অমনি দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। আমার উপরে দশবর্ষব্যাপী এই সনাতন চাণক্যনীতির প্রয়োগে অন্তরের পিতৃভক্তি যে একটুও কমিয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে অতি শৈশবে অষ্টপ্রহর পিতার কাছে থাকিয়া, তাঁর প্রতি যে একটা গভীর আসক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা এই তাড়নাতে যে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এই সত্য কথাটা গোপন করাও অনাবশ্যক।

এই তাড়নার যুগে বাবা আমাকে কখনও ‘প্রাণতুল্যেষু’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন কি না মনে পড়ে না। না করাই সম্ভব। তখনও পিতা-পুত্রে পত্র-ব্যবহারের প্রয়োজন ও অবসর উপস্থিত হয় নাই। পঞ্চদশ বর্ষ বয়:ক্রম পর্য্যন্ত পিতার কাছেই ছিলাম। আর ষোড়শবর্ষ প্রাপ্তিমাত্র আমার সঙ্গে বাবার ব্যবহার একেবারে বদলাইয়া গেল। আর মারধোর

নাই। অপরাধ করিলে কখনও অতি সামান্য ভর্ৎসনা, আর অধিকাংশ সময়ে গভীর আক্ষেপই, তাহার যথাযোগ্য দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। তখন পুত্র মিত্রত্ব লাভ করিয়াছে। যতদূর মনে পড়ে, বোধ হয় এই সময় হইতে বাবা আমাকে ‘প্রাণতুল্যেষু’ বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করেন।

তখন সবে জীবন-নদীতে কুল কুল করিয়া যৌবনের জোয়ার উজান টানে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার উপরে ইংরেজি শিখিয়া, বিদেশী সাধনার রূপে ও রসে আকণ্ঠ ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করিয়াছি। এ সাধনায় পুত্রকে মিত্ররূপে দেখার রীতি আছে, কিন্তু প্রাণতুল্য বলিয়া ডাকার অধিকার নাই। এ রাজ্যে কেবল স্বামী-স্ত্রীতেই এরূপ সম্বোধন করা চলে, অন্য কোন সম্বন্ধে ইহা শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং তখন বাবার এই অনুপম স্নেহ-সম্ভাষণের মর্ম ও মর্য্যাদা যে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। এখনই যে ইহার নিগূঢ় মর্ম ও প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছি, এমন বলিতে পারি না। কিন্তু একদিন পুত্রের প্রতি এরূপ সম্ভাষণ প্রয়োগ করা যতটা কেমন-কেমন ঠেকিত, আজ আর সেরূপ ঠেকে না, এ কথাটা সত্য।

আমিও ভগবৎ-প্রসাদে পুত্রলাভ করিয়াছি। কিন্তু কখনও তো তাহাদিগকে এভাবে সম্বোধন করি নাই। আমাদের নূতন সভ্যতা ও সাধনায় এ সম্বোধনটা গৃহিণীদেরই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। সন্তানের প্রতিও এরূপ সম্বোধন প্রয়োগ করিলে, আধুনিক দাম্পত্য-দণ্ডবিধি অনুসারে তাহা যে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না, সাহস করিয়া এমন কথাও বলা যায় না। আর পুত্রদের প্রাণতুল্যেষু বলিয়া সম্বোধন করি না, এই জন্য যে আমাদের আধুনিক পিতৃস্নেহ এই সম্বোধন ব্যতিরেকে যথোপযুক্ত অভিব্যক্তি পাইল না, ইহা কোন দিন অনুভব করি নাই। বিধাতার কৃপায় আজ তারা বাঁচিয়া আছে। বুকে ধরিয়া এতদিন তাহাদের মানুষ করিয়াছি। শৈশবাবধি তারা আমার প্রতিদিনের অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া, প্রাণটাকে তাদের ক্ষুদ্র জীবনের শত কর্ম-চেষ্টার দ্বারা চারিদিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। আজ যদি আমার ঘর অন্ধকার করিয়া তারা চলিয়া যায়, প্রাণে অত্যন্ত বেদনা পাইব, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমার বাবা আমাকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমি যে আমার পুত্রদের সে চক্ষে দেখিয়া থাকি বা দেখিতে পারি এমনটা কখনও বলিতে পারি না।

আমার বাবা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশাবধি কায়মনে আমার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। বিবাহ করিয়া অবধি তিনি একাগ্র অন্তরে আমাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। দীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি আমার আসার পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। আমি না আসিলে তাঁর সংসার নিষ্ফল, জীবন শূন্য, সর্ববিধ কর্ম-চেষ্টা ও সামাজিক ধর্ম-সাধনা বন্ধ্যা হইয়া থাকিবে, তাঁর বিশ্বাস ছিল। আমাকে না পাইলে তাঁর নিজের পিন্ডলোপ ও পিতৃলোকের তর্পণ বন্ধ হইয়া যাইবে, এই ভাবনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। তিনি প্রজোৎপত্তির জন্য দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কমোপভোগের জন্য করেন নাই। সেকালের সমাজ আজিকার মত এমন নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে নাই। সুতরাং সেকালের লোকে কামোপভোগের জন্য দারপরিগ্রহ

করিতেন না, কেবল পুত্রার্থে ভার্য্যা গ্রহণ করিতেন। কুলপাবন সৎপুত্র ধর্মরক্ষা করিবে, দেব-পিতৃলোকের সেবা অব্যাহত রাখিবে, এই জন্যই তাঁরা দারপরিগ্রহ করিতেন। সুতরাং বিবাহ করিয়া তাঁরা সর্বদাই পুত্র কামনা করিতেন।

আমার বাবা সত্য সত্যই আমার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। আমার মা অতি শিশুকাল হইতে, মাঘ মাসের দুরন্ত শীতে প্রত্যুষে স্নান করিয়া সেই সিক্তবস্ত্রে তরুণ অরুণের দিকে চাহিয়া উষার উদ্ভিন্ন আলোকে বিশ্বে যখন নূতন চেতনা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে, তখন আমারই জন্য বর-প্রার্থনা করিতেন; আর সন্ধ্যা পর্যন্ত একই স্থানে দাঁড়াইয়া, প্রহরে প্রহরে সূর্য্যমুখী ফুলের মত, আপনার বিকচকমলোপম মুখখানি সূর্য্যদেবের দিকে ফিরিয়া, সারাদিন সেই একই প্রার্থনার আবৃত্তি করিতেন। সুতরাং আমি একটা সামান্য রক্তমাংসের পিন্ডের মত, তাঁদের ঘরে আসিয়া পড়িয়া অশেষ উৎপাত বাধাই নাই। আমি তাঁদের তপস্যার ফল, দেবতার বর। তাঁদের পূর্ব জন্মার্জিত সুকৃতির পুরস্কার রূপে তাঁদের কোলে আসিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এইভাবে তাঁরা আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য আমার আসার পূর্ব হইতেই তাঁরা কত ব্রত, কত পূজা, কত শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া, কত সন্তর্পণে, কত শ্রদ্ধাভরে, আমার প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মাতৃগর্ভে আমার সঞ্চার হইয়াছে, এ সংবাদে পিতামাতা, পরিবার পরিজন, আত্মীয় কুটুম্ব সকলের মুখে কি আনন্দ, প্রাণে কত আশা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিলে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতা আমাদিগকে এসকল পুরাতন কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিতেছে। ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা’ এই প্রাচীন উপদেশে আমাদের আধুনিক দাম্পত্য আদর্শে আঘাত লাগে। সহধর্মিণীকে আমরা ‘সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র’ বলিয়া ভাবিতে রমণী কুলের মর্য্যাদা হানির ভয়ে ভীত হইয়া উঠি। অথচ তাঁহাদিগকে কামোপভোগের সহায় বলিয়া মনে করাতে সভ্য সমাজের শিষ্টতায় কোন বিশেষ ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় না। এই কামোপভোগকে আমরা অবশ্য ঠিক কামোপভোগ বলি না। ইহাকে আমরা রোমান্স-romance-বলিয়া থাকি। স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্য সম্বন্ধকে আমরা প্রজোৎপত্তির সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্কশূন্য করিয়া একটা আধ্যাত্মিক যোগ ও উচ্চাঙ্গের রসানুভূতির উপায়রূপে ব্যাখ্যা করি। কিন্তু এ সকল কবিত্ব ও কল্পনার আবরণ ভেদ করিয়া এই আধুনিক দাম্পত্য-আদর্শের নিজস্ব স্বরূপটী ধরিতে পারিলে, কামোপভোগই যে তার চরম লক্ষ্য হইয়া আছে, ইহা স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যায়। তবে অতি অল্পকাল হইতে বিলাত ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে ইউজেনিকস্ (eugenics) বলিয়া যে নূতন বিজ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে আমাদের পুরাতন আদর্শের সন্ধানে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, এ কথা সত্য। কিন্তু এখনও আমাদের এই অভিনব সভ্যতায় সন্তানসম্ভাবিতা রমণী অপরাধীর মত আত্মগোপন করিয়া চলেন।

ফলত: এই সভ্যতা আমাদিগকে আজ এতটা সৌখিন ও স্বার্থপর করিয়া তুলিতেছে যে সন্তানরূপ অমূল্যনিধি পাইব, একথা শুনিলে আমাদের সময়ে সময়ে আতঙ্ক উপস্থিত

হয়। রমণীগণ সন্তান ধারণের ক্লেশটা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়েন; সন্তান গর্ভে ধারণই যে নারীজন্মের চরম সার্থকতা লাভ হয়, ইহা বুঝিতে পারেন না। পুরুষেরা সন্তান-পালনের দায়িত্বের কথা মনে করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠেন; বংশরক্ষা যে জীবের সংসারের মুখ্য লক্ষ্য এ জ্ঞান আমাদের ক্রমে যেন লোপ পাইতেছে। সন্তানলাভ না করিলে, বৃদ্ধ বয়সে ঘরটা শূন্য শূন্য ঠেকে না যে তাহা নয়। যাঁরা সন্তানলাভ করেন না, তাঁদের প্রাণের ভিতরে যে একটা শূন্যতা সর্বদা জাগিয়া থাকে না, এমনও বলা যায় না। সন্তান জন্মিলে যে তাঁদের একটু আধটু আনন্দ হয় না, তাহা নয়। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও আমরা যে সন্তানলাভের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের মত কোনও প্রকারের ব্যাকুলতা অনুভব করি না, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সন্তান না হইলেই আমরা বাঁচিয়া যাই, অনেক সময় এরূপ কল্পনা করিয়া থাকি। দু' একটি পর্য্যন্ত হয় হউক, তার বেশি না হয়, সে আকাঙক্ষা অনেকেই করেন। ছেলেপিলেতে ঘর পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক, বিদেশীয় পলিটিক্যাল ইকনমির দুর্বিষহ ভাবনায় পীড়িত প্রাণে এ প্রাচীন আকাঙক্ষা কিছুতে স্থান পায় না। যাঁরা বেশি সভ্য ও কর্তব্যপরায়ণ, তাঁরা যে বিবি বেশান্তের প্রথম যৌবনের আবিষ্কৃত ফিলজফির ফল আহরণ করিয়া, আপনাদের সন্তানভার একান্ত লাঘব করিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেন না, এমনও বলিতে পারি না। সুতরাং এ যুগে কেহ কোন দিন, আমাদের পূর্বপুরুষদের মত সন্তানলাভের জন্য তপস্যা করেন বলিয়া মনে হয় না।

সন্তান-বাৎসল্য সাধারণ জীবধর্ম। সুতরাং সন্তান জন্মিলে স্বভাবের টানেই, আমরাও তার প্রতি স্নেহশীল হইয়া থাকি, সন্দেহ নাই। সন্তানের প্রতি আমাদের আসক্তি নাই, এমন নয়। কিন্তু এ আসক্তি জীবমাত্রেরই আছে। জলের শীতলতার ন্যায়, অগ্নির উত্তাপের ন্যায়, বায়ুর গতিশীলতার ন্যায়, জীবের সন্তানের প্রতি মমতাও একটা নৈসর্গিক বিধান। ইতর জন্তুর সঙ্গে আমরাও এই সার্বজনীন নৈসর্গিক বিধানের অধীন; আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিবিধ সংস্কারের সাহায্যে এই সাধারণ জীবধর্মকে মোক্ষধর্মের অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা সন্তান বাৎসল্যের এই মোক্ষ সম্পর্কটি ভুলিয়া গিয়াছি। পারত্রিক কল্যাণের জন্য যে পুত্রলাভ প্রয়োজন, এ সংস্কার আমাদের নাই; সুতরাং আমরা পুত্রার্থে ভার্য্যা গ্রহণ করি না, আর বিবাহের পরে পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করি না। এবং এই জন্যই পুত্রকে প্রাণতুল্যেযু বলিয়া সম্বোধনও করি না।

পিতা-পুত্রে

বিপিনচন্দ্র পাল

যে যাহা নয়, সে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। এ জগতে যে পিতা হয় নাই, সে পিতৃস্নেহ বস্তুটি যে কি, ইহা কোনো মতে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। সন্তানেরা বাৎসল্যের মর্ম জানে না বলিয়া, সংসারে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে এতটা পরিমাণে দারুণ বিবাদ জাগিয়া উঠে।

আমার বাবা আমাকে কতটা স্নেহ করিতেন, তাঁর কত আশা-ভরসা আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের উপরে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আর আমি যখন অবলীলাক্রমে সে সব ভাঙিয়া চুরিয়া দিলাম, তখন তাঁর প্রাণে কি আঘাত লাগিয়াছিল, এ সকল সে বয়সে কিছুই বুঝি নাই। এখন নিজে ভগবৎকৃপায় পুত্র লাভ করিয়া একটু আধটু তাহা বুঝিতেছি। প্রথম যৌবনে এ জ্ঞান থাকিলে, জীবনগতি অন্যপথ ধরিয়া চলিত কি না জানিনা; কিন্তু যে নিদারুণ ঔদাসীন্য সহকারে পিতৃস্নেহের সমুদয় দাবী-দাওয়াকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা যে পারিতাম না, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আর সে সময়ে বাবা যে আমাকে 'প্রাণতুল্যেষু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, ইহার ভিতরে কি মর্মন্তুদ বিষাদ জাগিয়াছিল, আজ তাহা যতটা বুঝিতেছি, তখন তার শতাংশের একাংশ বুঝি নাই।

বাবার সেই শেষ চিঠিখানার কথা, আজিও মনে আছে। তখন আমি কলিকাতায় পড়াশুনা করি। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা-সূর্য্য তখন মধ্যাহ্ন-গগনে বিরাজ করিতেছে। ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদল একদিকে কেশবচন্দ্রের ও অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া, য়ুরোপের আমদানি অভিনব ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার বা Individualistic Freedom-এর আদর্শে একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তখন এক উদ্ভট মুমুক্ষুত্বের প্রেরণায় ধর্ম্মের, সমাজের, পরিবারের, জীবনের সকল বিভাগের প্রাচীন ও প্রচলিত বন্ধনগুলিকে আমরা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছি। ঐ স্রোতের টানে আমিও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িয়াছি। এ সকল কথা শুনিয়া বাবা প্রথমে ভর্ৎসনা, পরে অভিমান, সর্বশেষে আমার খরচপত্র বন্ধ করিয়াছেন। বহুদিন পিতাপুত্রে দেখা সাক্ষাৎ বা পত্রব্যবহার হয় নাই। তার পূর্বেই আমি মাতৃহীন হইয়াছিলাম। আমার সহোদরও কেহ ছিল না। আমার ধর্মত্যাগে বাবা পিন্ডলোপের আশঙ্কায় শেষে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। লোকমুখে আমি এ কথা শুনিয়াছিলাম।

কিন্তু সহজে কথাটা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। বাবার বয়স তখন ৬৪। আর তাঁর প্রকৃতির মধ্যে কেহ কখনও কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখিতে পায় নাই। লোকে অতি বৃদ্ধবয়সেও বিবাহ করিয়া থাকে, সত্য। কিন্তু এ সকল লোকের চরিত্রের সঙ্গে আমার পিতৃচরিত্রের কোনো বিষয়েই কোনও মিল ছিল না। সেকালে আমাদের সমাজে তাঁর মতন সত্যনিষ্ঠ ও সাধুচরিত্র লোক বড় বেশি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। তখনকার লোকে উৎকোচ গ্রহণটাকে অপরাধের মধ্যেই গণ্য করিতেন না। কিন্তু আমার বাবা কখনও সামান্য ডালি পর্যন্ত গ্রহণ

করিতেন না। একদিনের কথা আমার আজি পর্যন্ত মনে আছে। বাবা তখন বরিশালের অন্তর্গত কোটেরহাট নামে এক চৌকিতে মুনসেফ ছিলেন; একদিন মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়াছেন, মা কলমি শাক পরিবেশন করিয়াছেন। বাবা কলমি শাক ভালোবাসিতেন, কিন্তু এ শাক তো সেকালে বাজারে বড় একটা বিক্রী হইত না, গৃহস্থেরা নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। এ জন্য এ শাক কোথায় পাওয়া গেল, বাবা প্রসঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, এক প্রতিবেশী পাটুনী বুড়ী দিয়া গিয়াছে। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তার শাকের দাম দিয়াছ?' মা বলিলেন, 'কলমি শাকের আবার দাম হয়, এতো কখনও শুনি নাই। সেও চায় নাই, আমিও দিই নাই?' এ কথা শুনিয়া বাবার অর খাওয়া হইল না। অমনি পাত ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন এবং বাইরে যাইয়া, পেয়াদা পাঠাইয়া, সেই পাটুনী বুড়ীকে ডাকাইয়া আনিয়া তার শাকের দাম দিয়া তবে কাছারীতে গেলেন। মার এই সামান্য অনবধানতাবশত: সেদিন বাবার আর খাওয়া হইল না। এ ঘটনা আমার চক্ষের উপরেই ঘটে। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়; কিন্তু আজি পর্যন্ত সে দৃশ্যটি আমার স্মৃতিপথে জাগিয়া রহিয়াছে। বাবার সেদিনকার সেই ঘটনা আজও যেন চক্ষের উপরে ভাসিতেছে।

এ বিষয়ে আর একটি ঘটনার কথা লোকমুখে শুনিয়াছি। তখন আমার জন্ম হয় নাই। বাবা তখন ঢাকায় সদর-আলার দপ্তরে পেস্কারি করেন। সদর-আলা সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যাহাতে বাবার ভাল হয়, সেদিকে তাঁর বেশ দৃষ্টি ছিল। এ সময়ে ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ রায়ের সঙ্গে দুর্দান্ত নীলকর ওয়াট সাহেবের একটা মামলা বাধে। এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সরজমিন তদন্ত করা আবশ্যক হয়। এই তদন্তের ভার সদর-আলা সাহেব বাবার উপরে অর্পণ করেন। সর-জমিনে উপস্থিত হইবা মাত্র কালীনারায়ণ রায়ের পক্ষ হইতে বাবাকে হাত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। কালীনারায়ণ রায়ের পক্ষে রিপোর্ট করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁর লোকেরা বাবাকে দু'হাজার টাকা উৎকোচ প্রদান করে। তখন কালীনারায়ণ রায়ের প্রতাপে সে দেশটা থরহরি কম্পিত ছিল, দু'একটা খুন করিলেও তার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর ছিল। বাবা বিপদে পড়িলেন। উৎকোচ লইলে ধর্মহানি, প্রত্যাখ্যান করিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। এ সঙ্কটে বিধাতা তাঁহাকে এক বুদ্ধি যোগাইয়া দিলেন। কালীনারায়ণ রায়ের লোককে তিনি টাকাটা ঢাকায় পাঠাইয়া দিতে বলিলেন, কারণ এত টাকা সঙ্গে লইয়া যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়, নিরাপদও নয়। ইহারা ভাবিল যে বাবা টাকা যখন লইবেন, তখন তাহাদেরই পক্ষে রিপোর্টও দিবেন। রিপোর্টটা বোধ হয় কালীনারায়ণ রায়ের পক্ষেই হইয়াছিল, কিন্তু উৎকোচের টাকা ঢাকা হইতে ফেরত যায়। এ সকল কথা তখন কেহ গোপন করিত না। বাবাকে কালীনারায়ণ রায় দু'হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, সে টাকা ঢাকা পর্য্যন্ত পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু বাবা তাহা গ্রহণ করেন নাই, অথচ তাঁরই পক্ষে রিপোর্ট দিয়াছেন, আদালতের উকীল-আমলা সকলেই এ কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। সদরআলার কানেও কথাটা উঠিল। তিনি তখন প্রকাশ্য আদালতেই আপনার পেস্কারের নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করিয়াছিলেন, ইহাও শুনিয়াছি। কারণ

বাবার দু'পয়সা লাভ হইক, এই জন্যই সদরআলা সাহেব তাঁহাকে এই সরজমিন তদন্ত করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

যেমন তাঁর সত্যনিষ্ঠা, সেইরূপ সংযম, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ আত্মনির্ভর এবং মানসিক তেজও ছিল। জীবনে তিনি কখনও কাহারও কথা শুনিয়া কোন কাজ করেন নাই। যখন যাহা কর্তব্য ও ধর্মসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার বিরোধী হইলেও তাঁহাকে সে কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা সম্ভব হইত না। একটা ঘটনার কথা এখনও বিশেষ ভাবে আমার মনে আছে। বাবা তখন বরিশালের কোটের-হাটে মুনসেফী করেন। পূজার সময় বাড়ী গিয়া শুনিলেন যে গ্রামের লোকেরা এক অসহায় ব্রাহ্মণ-পরিবারকে অন্যায় করিয়া সমাজচ্যুত করিয়াছেন। বাবা অমনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া আপনার পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। এজন্য আমাদিগকেও সমাজচ্যুত হইতে হয়। আর ষোল বৎসর পর্যন্ত বাবা এই এক ঘর ব্রাহ্মণ ও আমাদের দু'এক ঘর জ্ঞাতিবর্গকে লইয়া গ্রামের সমাজের বাহিরে পড়িয়া ছিলেন, এজন্য একদিনও কোন ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। দুটো মুখের কথা বলিলেই এই গোল মিটিয়া যাইত; কিন্তু কাহারও নিকটে খামকা মাথা হেঁট করা তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল। নিজের সুখ সুবিধার জন্য কখনও কাহারও নিকটে কোন উপরোধ অনুরোধ করাও তাঁর প্রকৃতিতে সম্ভব ছিল না। আর অসাধারণ মানসিক শক্তি ছিল বলিয়াই, তিনি জীবনের শেষ দশায় একমাত্র পুত্রকেও পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁর ঐ শেষ চিঠিখানি আমার নিকটে নাই। সে চিঠিখানাতে কেবল যে গভীর স্নেহ উঠিয়াছিল তাহা নহে, তার প্রতি অক্ষরে একদিকে বজ্রকঠিন সংকল্প অন্যদিকে কুসুমকোমল বাৎসল্য কি অপূর্বভাবে মিশিয়া গিয়াছিল, কর্তব্যের অনুরোধে, ধর্মের আদেশে, একমাত্র 'প্রাণতুল্য' পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে তাঁর মর্মের গ্রন্থিগুলি কিরূপে একে একে ছিঁড়িয়া যাইতেছিল,--স্মৃতিতে আজ সে সকল কথা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যখন প্রথম চিঠিখানা এ হতভাগ্যের হাতে পড়ে, তখন যৌবন-স্বভাব-সুলভ ঔদ্ধত্য ও নির্মমতা নিবন্ধন তাহা ধরিয়া উঠিতে পারি নাই, নতুবা পিতৃস্নেহের অমন অমূল্য নিদর্শনটাকে এতটা অযত্নে হারাইয়া ফেলিতাম না। সেই ছোট চিঠিখানা আমার পিতৃচরিত্র অতি উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করিয়াছিল। তাহাতে গালি ছিল না, ভর্ৎসনা ছিল না, আমাকে সমাজে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কোন কাকুতি মিনতি কিছুই ছিল না। আমার সমাজ ত্যাগে তাঁর মর্মে মর্মে যে আগুন জ্বলিয়াছিল, সে মর্মভেদ জ্বালা যন্ত্রণারও কোন কথা ছিল না। তাহাতে বাবা কেবল জীবনের 'ভুল'গুলিকে একটি একটি করিয়া, সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া, তাঁর শেষ ভুলের, বার্দ্ধক্যে দারপরিগ্রহ করার সংবাদটি আমায় দেন। চিঠিখানার মর্ম এইরূপ ছিল :

প্রাণতুল্যেষু,

আমার জীবনে অনেকগুলি বড় ভুল করিয়াছি। তারই ফলে শেষ বয়সে আজ আমাকে এই দশায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল।

আমার প্রথম ভুল--তোমাকে ইংরেজি শিখাইবার জন্য মুনসেফী ছাড়িয়া আবার ওকালতি আরম্ভ করা। আমার একসঙ্গে যাঁরা মুনসেফী করিতেন, তাঁরা আজ সদর-আলার পেনশন লইয়া সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করিতেছেন। তোমাকে ইংরেজি শিখাইবার বেশী সুবিধা হইবে বলিয়া আমি সে সম্মান ও শান্তি বিসর্জন দিয়াছি।

আমার দ্বিতীয় ভুল--তুমি যখন এন্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করিলে, তখন তোমাকে আরও বেশী লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কলিকাতায় পাঠান। তখন যদি তোমাকে আমার কাছে রাখিয়া দিতাম, তবে আমার এ অবস্থা হইত না।

আর আমার তৃতীয় ভুল--এই বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিবাহ করা। হয়ত ইহাতে তোমার কতকটা সুবিধা করিয়াই গেলাম। দুর্গামোহন দাসের মত তুমিও ক্রমে আমার এই ভুলের জন্য ধর্মার্জনের আর একটা সুযোগ পাইবে।

ত্যাজ্যপুত্র

বিপিনচন্দ্র পাল

বাবার সেই চিঠিখানার পরে আট বৎসরকাল আর পিতা-পুত্রে কোন পত্রব্যবহার হয় নাই। এই আট বৎসরের মধ্যে দুইবার মাত্র উভয়ে সামান্য দেখাশুনা হইয়াছিল। প্রথমবারে আমি গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে কটক হইতে বাবার সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই শ্রীহট্টে যাই। তখনও প্রাচীন সমাজের সঙ্গে যোগ একেবারে কাটিয়া যায় নাই। আমার দিক দিয়া একরূপ কাটিয়াই গিয়াছিল, কিন্তু সমাজের দিক দিয়া একেবারে কাটিয়া যায় নাই। সুতরাং বাবার প্রাণের আশা, অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িলেও, একেবারে নিঃশেষ নির্মূল হয় নাই। আমার মতন অনেকে প্রথমে যৌবনে একান্তভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া, পরে পুরাতন সমাজে যাইয়া বিবাহাদি করিয়া, স্বচ্ছন্দে আর দশজনের মত সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এরূপও দেখা গিয়াছে। আমাদের আত্মীয় কুটুম্ববর্গের মধ্যেই এরূপ দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছিল। সুতরাং আমার পক্ষেও যে তাহা একেবারে অসম্ভব, এমনটা ভাবিবার কোন কারণ ছিল না। বাবা বোধহয় সেইরূপই ভাবিতেছিলেন। তাই আমি যখন পড়াশুনা ছাড়িয়া কটকে এক নূতন স্কুলে কর্ম লইয়া নিজের জীবিকার পথ নিজে করিয়া লইতে লাগিলাম, তখন বাবা আমায় একবার ডাকিয়া পাঠান। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পরে, সেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। ঘটনাগুলো আমার ঠিক মনে নাই, কিন্তু যে দিন আমার শ্রীহট্টে পৌঁছিবার কথা ছিল, তার প্রায় ৪/৫ দিন পরে আমি যাই। সেকালে ঢাকা হইতে শ্রীহট্টে জলপথে, ষ্টীমার বা নৌকায় যাতায়াত করিতে হইত। আজিকালি যেমন দৈনন্দিন ডিস্প্যাচ ষ্টীমারের ব্যবস্থা আছে, সেকালে তাহাও ছিল না। জাহাজগুলো কখনও একটা কখনও বা দুইটা গাদাবোট সঙ্গে জুড়িয়া মন্থর গতিতে চলিত আর মাঝে মাঝে বড় বড় বন্দরে মাল খালাস ও বোঝাই করিয়া লইত। এ কারণে অনেক সময় পথে দু'দিনের স্থানে কখনও চারিদিন এমন কি ছয় দিন পর্য্যন্ত বিলম্ব হইত। তারপর তখনও পুরা বর্ষা নামে নাই। হেমন্তকালে জাহাজ একেবারে শ্রীহট্টে যায় না। এক পথে গেলে ছাতক হইতে, অন্যপথে গেলে বালাগঞ্জ হইতে, নৌকাযোগে শ্রীহট্ট যাইতে হইত। ইহার মধ্যে বালাগঞ্জের পথটাই বড় লম্বা। আমার যতদূর মনে হয় এই বালাগঞ্জের পথেই আমি সেবারে শ্রীহট্টে গিয়াছিলাম। আর আমার পক্ষে এতটা বিলম্ব হইয়া গেল বলিয়া, বাবার কতটা যে ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা এখন মনে করিলে চক্ষে জল আসে; তখন তেমন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বাবা প্রতিদিন আমার আসার পথ চাহিয়া রহিতেন। সকাল বিকাল কতবারই নানা ছলে নদীঘাটে যাইতেন। তিনি মনে ভাবিতেন যে তাঁর চারিদিকে যারা থাকিত, তারা বাৎসল্যের এই লীলাখেলাটা কিছুই বুঝে না। তিনি আপনিও তাহা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মানুষের প্রাণে যখন কোন রস উদ্বেলিত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে ঢাকিয়া রাখা সহজ নহে। বাবা যতবার এ কাজ ও কাজের ছুতা করিয়া

নদীর ঘাটে বা নদীতীর দিয়া আমার নৌকার প্রত্যাশায় যাতায়াত করিতেন, ততবারই তাঁর প্রাণের আসল কথাটি যে কি ছিল, ইহা তাঁর পরিজনবর্গ সকলেই ধরিয়া ফেলিত।

ফলত: এক নিম্নতম শান্ত রস ছাড়া, আমাদের আর সকল রসেতেই অদ্ভুত বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। শান্ততে কোন উচ্ছ্বাস নাই, কোন রসান্তরের প্রভাব নাই; শান্তর লক্ষ্য সমাধি,--লীলা সম্ভোগ নহে। সুতরাং এ'রসে কোন বিশেষ বিচিত্রতা প্রকাশিত হয় না। এ'ছাড়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর মাধুর্য্যের তো কথাই নাই, এই সকল রসেতেই নানা প্রকারের বিচিত্র ছলাকলা ফুটিয়া উঠে। দাসও প্রভুর প্রতি অভিমান করিয়া থাকে, সখাতে ও সখাতে এ সকল মান অভিমান খুবই দেখা দেয়। বাৎসল্য যখন অতিশয় গভীর হয়, তখন তাহাতেও এগুলি বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠে। মা এই অভিমান ভরেই, অন্তরে অন্তরে যে সন্তানকে বুকের ভিতরে টানিয়া, প্রাণ চিরিয়া, তার মাঝখানে পুরিয়া রাখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠেন, সেই সন্তানকে 'মর না' বলিয়া গালি দিয়া, হাতে ঠেলিয়া দূর করিয়া দেন। এ বস্তু ক্রোধ নহে, বিদ্বেষ নহে, বিতৃষ্ণা নহে, অপ্রেম বা নির্ম্মমতা নহে, কিন্তু অতিশয় গভীর বাৎসল্যেরই বিকার মাত্র। এ বাৎসল্যও কখনও কখনও 'তপ্ত ইক্ষুর' মত একই সঙ্গে প্রাণের শ্রেষ্ঠতম আরামের ও তীব্রতম জ্বালার কারণ হইয়া উঠে। আমার দুর্ব্যবহারে বাবার প্রাণগত অমূল্য বাৎসল্য রস যে এই 'তপ্ত ইক্ষুর' মত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এ হতভাগ্য তাহা বুঝে নাই; আর এই বার্দ্ধক্যে, সেই পুরাতন স্মৃতিগুলিকে আশ্রয় করিয়া, তাহা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে।

সত্য কথা বলিতে গেলে, আমার মনে হয় যে আমার দেশের প্রাচীন রীতিনীতি ও সভ্যতা ভব্যতা হইতে এই অতি অল্প কাল মধ্যেই এতটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের পক্ষে পূর্বপুরুষদের ভাব স্বভাব ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠা যেন একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁদের এমন একটা গভীর সংযম ছিল, যাহা আমরা একেবারেই মনে হয় বুঝি হারাইয়া বসিয়াছি। তাঁরা সর্বদা আত্মগোপন করিতে পারিতেন। আমাদের মতন অতি সামান্য রসানুভূতিতে হাঁকাহাঁকি লাফালাফি করিতেন না। সকল বিষয়েই তাঁরা একান্ত অন্তর্মুখীন ছিলেন; আর আমরা সকল বিষয়েই এখন নিতান্ত বর্হিমুখীন হইয়া পড়িয়াছি। তাঁরা রস হজম করিতেন, ইহাই তাঁদের সাধনা ছিল। আমরা রস বমন করিতে না পারিলে কিছুতেই যেন তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। তাঁদের চাল-চলনে, ধরণ-ধারণে, কথাবার্তায়, পত্রে ব্যবহারে, জীবনের সকল বিভাগে ও সকল কর্মে একটা সংযমের ও শিষ্টতার, একটা নিয়মের ও ধর্মের, একটা ভব্যতা ও আচারের বন্ধন ছিল, যাহা হারাইয়া আমাদের আধুনিক চরিত্র, তাঁহাদের চরিত্রের তুলনায় অতিশয় হালকা হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সেকালের লোকচরিত্রের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ বা মর্য্যাদা গ্রহণ করাও আমাদের পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যকালে আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে এমন পুত্র-শোকাতুর পিতাকে দেখিয়াছি, রূপযৌবন-সম্পন্ন পুত্রের মৃতদেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াও যাঁহাদের চক্ষে জল, কিম্বা কণ্ঠে ক্রন্দন ধ্বনি ফুটিয়া বাহির হইতে পারে নাই, অথচ সে শোক নির্বাক

নিস্পন্দ বলিয়াই আমাদের মুখর শোকাবেগ অপেক্ষা শতগুণ, সহস্রগুণ বেশি গভীর ছিল সন্দেহ নাই। আমার পিতৃচরিত্রেও এই গাম্ভীর্য্যের ভাবটি খুব ফুটিয়াছিল। জীবনে তাঁহাকে অনেক গভীর শোকবেদনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমরা ১০/১২টি ভাই বোন ছিলাম, তার মধ্যে ক্রমে দুটি মাত্র অবশিষ্ট রহিলাম, আর তার মধ্যে আমার কনিষ্ঠা আবার যৌবনপ্রান্তে উপস্থিত হইতে হইতেই বিধবা হয়। বাবার বয়স যখন ৬০ তখন আমার মাতৃবিয়োগ হয়। কিন্তু একের পর এক, এইরূপ বহুতর শোকের আঘাতেও তাঁর স্থৈর্য্য বা ধৈর্য্যকে তিলার্ধ পরিমাণে বিচলিত করিতে পারে নাই। অথচ তাঁর প্রাণটা যে কঠোর ছিল এমন কিছুতে বলা যায় না। কি শহরে থাকার সময়, কি পল্লীগ্রামে যখন শেষ জীবনে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, এমন কি শহরের বা গ্রামের নি:সম্পর্কীয় লোকদেরও সুখদুঃখে, রোগে-শোকে, সর্বদা তাহাদের সেবাযত্ন করিয়া বেড়াইতেন। একটি শ্লোক তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন; সেটি এখনও আমার খুবই মনে আছে। শ্লোকটি এই :

নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রা:
ময়ূরা: ঘনগর্জনে।
সাধব: পরকার্য্যেষু
দুর্জনা: পরপীড়নে।।

আর এই শ্লোকটিই তাঁর কর্মজীবনের মূলমন্ত্র হইয়া যেন ছিল।

শুনিয়াছি, আমি যখন অপোগণ্ড বালক, তখন একদিন কাছারী হইতে ফিরিবার পথে বাবা একটি অসহায় বসন্তরোগীকে পথিপার্শ্বে পড়িয়া আছে, দেখিতে পান। আজিকালি আমরা স্বাস্থ্যরক্ষার তত্ত্বসকল শিখিয়া যে ভাবে সর্বদা আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াই, সেকালের লোকেরা তাহা করিতেন না। তাঁরা জানিতেন যে জীবন মরণ একজনের হাতে আছে, তাঁর যে দিন হুকুম হইবে, সেদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুটিয়াও তাহাকে এ সংসারে টানিয়া রাখিতে পারিবে না। আর যতদিন না সে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, ততদিন বিশ্বসংসার মিলিয়া তাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। আজিকালি আমরা ইহাকে অন্ধবিশ্বাস, ফ্যাটালিজম (fatalism) প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকি; আর এ বস্তু যে নিতান্ত অযৌক্তিক ও মনুষ্যত্ব-বস্তু লাভের একান্ত অন্তরায়, এমনটাও ভাবি এবং বলি। কিন্তু আমাদের এই সকল উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞানে আমাদিগকে যে আমাদের পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা অনেকগুণ স্বার্থপর ও হীনচিত্ত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা ভাবিয়া দেখি না। অন্যদিকে আমাদের নিজেদের সমাজে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে আমাদের স্বাদেশিক সভ্যতা ও সাধনাতে পরার্থপরতা ও লোকসেবা প্রবৃত্তি কতটা যে একদিন ফুটিয়াছিল, উহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া বা সন্ধান না করিয়া বিলাতী ছাঁচের ও বিদেশী ঝাঁঝের ফিল্যানথ্রফির (philanthrophy) প্রতি গভীর অনুরাগ সাধন করিয়া, আপনাদের সভ্যতার ও ধর্মের, সাধনার ও লোকচরিত্রের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া থাকি। আমাদের শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণও এরূপ করিয়া থাকেন। এর জন্য

ইহাদের নিন্দা করি না। ইহারা ইংরেজের রাজধানীতে জন্মিয়া সেখানকার বিমিশ্র-সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছেন। দেশের সত্যিকার প্রাণ-বস্তুর, সমাজের চিরন্তন প্রকৃতির সন্ধান কলিকাতা শহরে বা এই রাজধানীর উপকণ্ঠে, এমন কি আজিকালি আধুনিক সভ্যতা পশ্চিমবঙ্গের পল্লীজীবনকে পর্য্যন্ত এতটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, যে গ্রাম্য সমাজেও পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা শৈশবে, বাংলার সুদূর পল্লীতে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার হিন্দু মুসলমান সমাজে যাহা দেখিয়াছি ও পাইয়াছি, তাহার তুলনায় আজিকার এই জ্ঞানগর্বিত সভ্যতাভিমানকে কোন কোন দিক দিয়া বিচার করিলে একান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু বলিয়া মনে হয়। আর সেকালের তুলনায় আমরা আজিকালি কতটা পরিমাণে যে স্বার্থপর ও সুখপ্রিয়, ভোগলিপু ও শমনভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। আর যখনই আজিকার বিশ্বমানব-প্রেমিকেরা আমাদের প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার কর্মবহুলতা, বহির্মুখীনতা, স্বার্থপরতা ও জনহিতব্রতে ঔদাসীন্যের কথা বলিয়া, নূতন সভ্যতা ও সাধনার মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তখন সর্বদা আমার বাল্যস্মৃতিগুলি স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাদের এ অলীক অপবাদের প্রতিবাদ আরম্ভ করে। আর এই স্মৃতিগুলির কেন্দ্রস্থলে আমার পিতৃদেবের জীবনের বহুবিধ ঘটনা সর্বদা উজ্জ্বল হইয়া আসিতে থাকে। এসকল স্থলে সর্বদা প্রায় আমার মনে এই কথাটা জাগিয়া উঠে--'বাবা আমার মতন তো আর আধুনিক লেখাপড়া কিছু শিখেন নাই; লোকহিতব্রতে ঢাকঢোল বাজাইয়া জীবনও উৎসর্গ করেন নাই; ধর্মের নামে পরিবারের, সমাজের আত্মীয়স্বজনবর্গের প্রতি সর্ববিধ কর্তব্যের বোঝা নামাইয়া, বিশ্বমানব-প্রেম সাধনের জন্য তো দুনিয়ার পথে বাহির হন নাই। কিন্তু এই যে পথ হইতে বসন্ত রোগীটিকে আপনার বাড়ী আনিয়া, নিজে তার সেবাশুশ্রুষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আমি কি তাহা পারি? পাড়ায় বসন্ত হইয়াছে শুনিলে আমার লোকহিতচিকীর্ষু প্রাণ অপনাকে ও আপনার স্ত্রীপুত্র পরিবারকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পালাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। দাসদাসীদের কাহারো সামান্য জ্বর হইলে, কি জানি অতিসারে দাঁড়ায়, সেই ভয়ে তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইবার ছুতা খুঁজিয়া বেড়াই। আত্মীয় কুটুম্বের কাহারো কোনো সংক্রামক রোগের সংবাদ পাইলে, তাহাদের দরজা হইতে যাতে ফিরিয়া আসিতে পারি, তারই নানা অছিলা খুঁজিয়া বেড়াই। বালকদের সতীর্থগণের মধ্যে কাহারও বেশী অসুখ হইলে, যাহাতে তাহারা সে বাড়ীর কাছ দিয়া না যায়, সে হুকুম জারি করি। এই অভিনব আলোক ও উদার বিশ্বপ্রেমের সন্ধান বাবা কোনো দিন পান নাই, অথচ পথ হইতে রোগী কুড়াইয়া আনিয়া নিজের বাড়ীতে সেবাশুশ্রূযার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এ সকল যখন ভাবি, তখন আধুনিক সভ্যতা ও সামাজিকতা, স্বদেশ-প্রীতি ও লোকহিতৈষার দামটা আর ঠিক রাখিতে পারি না। হতভাগ্য তারা যারা এদেশে জন্মিয়া, এ সকল চিত্র কখনও স্বচক্ষে দেখে নাই। আর অধিকতর হতভাগ্য তারা যাদের শিক্ষার ভার এ সকল অজ্ঞ অথচ বিজ্ঞতাভিমানী সংস্কারকদলের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

আর তিনি যে ভাবে অপরিচিত দীন-দুঃখীর সেবা করিতেন, তাহা মনে করিয়া

বাবার প্রাণটা যে বড় কঠিন ছিল এমনটা কিছুতে বলিতে পারি না। তিনি আমায় যে ভাবে স্নেহ করিতেন, আমার পুত্রদের আমি তার শতাংশের একাংশ স্নেহ করি কি না, সন্দেহ। কিন্তু এ স্নেহ বাহিরে বড় একটা উছলিয়া উঠিত না। আমার অসাক্ষাতে যতটা প্রকাশ পাইত, আমার সমক্ষে তার একাংশও প্রকাশিত হইত না। এই যে আমার শ্রীহট্ট পৌঁছিতে এবারে ক'দিন বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া, বাবার প্রাণ কতকটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, লোকমুখেই তার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। যখন তাঁর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম, তখন সে উদ্বেগের, সে উচ্ছ্বসিত বাৎসল্যের কোনো বিশেষ চিহ্নই আর দেখিলাম না। আমাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিলেন না, আমাকে বুকে টানিয়া ধরিলেন না; গদগদকণ্ঠে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না; কেন এত বিলম্ব হইল, প্রথমে সে খোঁজও লইলেন না। আমার পথে এই বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া, তাঁর বিনিদ্র-নিশীথের সেই তপ্ত নিঃশ্বাসের একটু স্মৃতিও আর বাহিরে প্রকাশিত হইল না। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে, কেবল মাত্র আমার শির আঘ্রাণ করিয়া, একটা কাজের অছিলা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, প্রাঙ্গণের সান্ধ্য অন্ধকারের আবরণে আপনার উচ্ছ্বসিত বাৎসল্যকে ঢাকিয়া রাখিতে গেলেন। হায়! আজ স্মৃতির চক্ষে যাহা দেখিতেছি ও বুঝিতেছি, তখন তাহা দেখি নাই ও বুঝি নাই। সেই সন্ধ্যায়, দীর্ঘকাল পরে বিদ্রোহী পুত্রের দর্শনে সে বাৎসল্যপূর্ণ পিতৃপ্রাণে কি ঝড় বহিতেছিল, আজ ভাবিলে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। একদিকে কি গভীর আকাঙক্ষা আমাকে বুকে চাপিয়া প্রাণ জুড়াইবার জন্য হইয়াছিল, অন্যদিকে কি সংযম ও সংকল্প, কি অসাধারণ আত্মসংবরণ ও আত্মগোপনের শক্তি জাগিয়া উঠিয়া সে আকাঙক্ষাকে চাপিয়া রাখিতেছিল আর এই সংগ্রামে প্রাণের পাঁজরগুলি এক এক করিয়া কেমন ভাবে মড়মড় করিয়া উঠিতেছিল; হয়ত সেই নৈশ অন্ধকারে দু'এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুও খসিয়া পড়িয়াছিল;-- এ সকল ভাবিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে; আর সে বাৎসল্যের মর্ম ও মর্য্যাদা বুঝি নাই বলিয়া প্রাণে গভীর অনুতাপের সঞ্চার যে হয় না, তাহাও বলিতে পারি না। কতক্ষণ যে এই সংগ্রাম চলিয়াছিল, মনে নাই। কিন্তু মনে আছে যে যখন বাবা অপর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁর মুখ প্রফুল্ল নয়, কিন্তু প্রশান্ত। আমায় বলিলেন-- 'তোমার সম্বন্ধে কি করিব, এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। তোমায় ঘরে তুলিব কি বাহিরে রাখিতে হইবে, আজও স্থির করি নাই। আজ রাত্রে ভাত খাইও না, জল খাবার খাইয়া থাক। একটু কষ্ট হইবে, কিন্তু কি করিব?'

আর আমাকে ঘরে তুলিলেন না। সেই দিন হইতে আমি ত্যাজ্যপুত্র হইলাম।